
পরিচয়

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

গল্প-পঞ্চাশৎ

২০·০০

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায়ের সুবিস্তৃত আলোচনা 'গল্পকার তারাশঙ্কর' গ্রন্থটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে

প্রাপ্ত কয়েকটি অভিমত :

তারাশঙ্করবাবুর একসঙ্গে এতগুলি গল্প, তার আলাদা মূল্য আছেই, কিন্তু এর পরিকল্পনা এবং রূপায়ণে যে রুচিকর আভিজাত্য রয়েছে সেটা তোমাদেরই প্রাপ্য। শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ রায়ের ৫০ পৃষ্ঠা ব্যাপী দীর্ঘভূমিকাটিও এর গৌরববৃদ্ধিতে যে সহায়তা করেছে সেকথা বলাই বাহুল্য। আমি তোমায় বইখানির জন্য অভিনন্দিত করছি।...

—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

তারাশঙ্করের গল্প-পঞ্চাশৎ গ্রন্থখানি হাতে পেয়ে সত্যি খুব আনন্দিত হয়েছি। এই রকমের মুদ্রণ ও গ্রন্থন পরিপাট্য আজকের দিনে বিরল।...এই গ্রন্থের গল্পগুলি মাত্র সংখ্যা পুরণের দায়িত্ব ছাড়াও আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় গৌরবমণ্ডিত। গল্প-নির্বাচনে লেখকের সাহিত্যবৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের বেষ্টনীর ব্যাপ্তিকে পাঠকের সম্মুখে তুলে ধরা হয়েছে এই গ্রন্থের পঞ্চাশৎ গল্পের মাধ্যমে।...বইটিকে ভালো না বেসে আমি পারছি না।

—গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

কাবিল কিয়া। বই হাতে পেয়ে মন ভরে গেল। জয়জয়াকার পড়বে।

—অবধূত

অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ রায়ের সুদীর্ঘ ভূমিকা সম্বলিত এই গল্প-সংকলন বাংলা সাহিত্যের এক নতুন সম্পদ। প্রকাশনা-সৌষ্ঠব অতি প্রশংসনীয়। এত সুন্দর মুদ্রণ, প্রচ্ছদ ও আঙ্গিক খুব কমই চোখে পড়ে।

—হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যা

মুকুন্দ পাবলিশার্স : ৮৮ বিধান সরণি : কলিকাতা ৪

(রসরাজ অমৃতলাল বসুর জন্মস্থান)

ভারতের নৃত্যকলা

গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্য নৃত্যকলা সম্পর্কে প্রথম সুবৃহৎ গ্রন্থ। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতের নৃত্যধারার ইতিহাস। নাট্যশাস্ত্র। অভিনয় দর্পণের মূল শ্লোক ও ব্যাখ্যাসহ নাট্যোৎপত্তি। নাট্যপ্রয়োগ, অভিনয় বিভাগ, মুদ্রালক্ষণ প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা। ভরতনাট্যম, কথাকলি, মণিপুরী, কথক—এই চারিটি মার্গ নৃত্যের সম্পর্কে ঔপপত্তিক ও ব্যবহারিক আলোচনা। লোকনৃত্য ও রবীন্দ্র নৃত্যধারা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা। প্রথিতযশা নৃত্যশিল্পীর গবেষণামূলক এই অনন্য গ্রন্থের মূল্যবান ভূমিকা লিখেছেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। বাইশটি আর্টপ্লেট ও শতাধিক চিত্র সমৃদ্ধ।

দাম : দশ টাকা

ইংলিশ চ্যানেল

কৃষ্ণা দত্ত

বাংলাদেশের অজ পাড়াগাঁয়ের মেয়ে সবিতা যেন লণ্ডনে দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। দর্শক অভিনেতা হতে পারল না। পাঞ্জাবী মেয়ে ভরতী বাঙালী হেমন্তের সঙ্গে বাঁধন রাখতে পারল না, গুজরাটী কমলা মনের মানুষের খোঁজে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াল, মলি গ্রহণ করতে পারল না মাদ্রাজী কুমারস্বামীকে, স্পেনের কণচিতা পাকিস্তানী প্রেমিকের খোঁজে হতাশায় ডুবে মরল, পর্তুগীজ মারিয়া আত্মসমর্পণ করে ফিরে গেল নিজের দেশে, খাস লর্ড পরিবারের রুথ বাঙালী বিয়ে করে আঁকড়ে থাকতে চাইল সংসার, জার্মান মেয়ে ডরিস দীনেনের সঙ্গে পাড়ি দিল লাতিন আমেরিকায়, প্রীতি শেষ পর্যন্ত বাঙালী বিয়ে করে ফিরল দেশে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার জ্ঞান, সম্পদ সঙ্গে নিয়ে। আরও কতো মেয়ে উচ্চাশা বুকে করে মুখর লণ্ডনে ঘুরে ঘুরে হতাশায় আছড়ে মরেছে!

দাম : সাত টাকা

নব পত্র প্রকাশন

৫৯ পটুয়াটোলা লেন । কলিকাতা-৯ । ফোন ৩৪-৬৬১৩

পরিচয়

বর্ষ ৩৩ । সংখ্যা ৫
অগ্রহায়ণ, ১৩৭০

সূচীপত্র

ছবি ও স্কেচ—জর্জ ব্রাক, নিখিলেশ দাস

প্রচ্ছদ—কানু বসু

সম্পাদক

গোপাল হালদার ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

পরিচয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।





প্রিয়তোষ মৈত্রেয়

...রতের আবদ্ধ আর্থনীতিক উন্নয়ন প্রসঙ্গে

ভারতের আর্থনীতিক উন্নয়ন পদ্ধতি প্রসঙ্গে সম্প্রতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠেছে। দেশের উন্নত শহর-নগর এলাকার ...র্বর্তী গ্রামগুলি আজও অনুন্নতির শেষ ধাপে থেকে গেছে, অর্থাৎ এসব ...ঞ্চলের উন্নয়নের প্রভাব পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে পড়েনি। তাই দেখা যাচ্ছে ... উন্নত শহরের পাশেই অনুন্নত জীবনযাত্রাসম্পন্ন গ্রাম। এবং এই ...মগুলির আর্থনীতিক জীবনে ক্রমাবনতিই ঘটছে, অর্থাৎ শহর নগরের শিল্পায়ন ...আর্থিক উন্নতি গ্রাম এলাকায় কোনো demonstration effect বা প্রদর্শনী-...তিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। বরং অন্যভাবে বলি, demonstration ...ffect এইসব গ্রামাঞ্চলে আর্থনীতিক কোনো উদ্যম সৃষ্টি করতে পারেনি ... ফলে সঞ্চয় বিনিয়োগ বৃদ্ধি ঘটে উৎপাদন বাড়বে। demonstration ...ffect-এর এই সুফলটা ফলে নি। আবার অনেকে বলছেন, এই ...emonstration effect-কে আত্মস্থ করে নেবার মতো ক্ষমতা গ্রামীন্ ...নীতিতে সৃষ্টি হয়নি।

...ারতে প্রায় ১০০ বছর পূর্বে আধুনিক শিল্পের পত্তন ঘটেছে এবং দীর্ঘকাল ... ভারতবর্ষ পাট এবং কার্পাস ও কার্পাসবস্ত্রের রপ্তানী করে আসছে। ...পথ যোগাযোগও প্রায় ১০০ বছর হল ঘটেছে। এবং ৫০ বছরের উপর ... গেল লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের পত্তন হয়েছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় হল, ...ায়নের অগ্রগতির হিসাবে ১৯৫১ সালে ভারত এবং এই শতকের ... দশকের ভারতের মধ্যে তেমন কোনো তারতম্য চোখে পরে না। ...ফ্রেড ম্যালেনবমের উক্তি এ সম্পর্কে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি

লিখেছেন : "India was not an appreciably more industrialised nation in 1951 than in the first decade of the century, at least in terms of the relative importance of modern industrial output and employment." (Prospects for Indian Development p. 31)

এর পেছনে দুটি কারণ আমাদের চোখে পড়ে। প্রথমটি বিদেশী স্বার্থে যে শিল্পায়ন কর্ম শুরু হয়েছিল মূলতই তা export oriented অর্থাৎ রপ্তানী বাণিজ্যমুখী এবং দ্বিতীয়টি হল, আমাদের দেশে শিল্পায়নে প্রথম পর্ব থেকে এমন কি পরিকল্পনাকালেও শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি অর্থনীতির উৎপাদন ও সংগঠন পদ্ধতিগত মৌলিক কোনো উন্নয়নমূলক পরিবর্তন ঘটেনি। আর এর ফলে, ক্রমাগত অবনতি ঘটেছে। অর্থাৎ নগরীকরণ বা urbanisation যেটুকু ঘটেছে তা সীমাবদ্ধ। এই ধরনের enclave development* কখনই কৃষিগত উন্নয়নকে উৎসাহিত করে না বা দুর্বল কৃষি আর্থনীতির পক্ষে এই ধরনের উৎসাহে সাড়া দেওয়াও সম্ভব হয় না। এই ধরনের কর্মপদ্ধতির ফলে দেখি একদিকে খুব উন্নত যদিও সীমিত নগরীকৃত এলাকা অপরদিকে অনুন্নত কৃষি অর্থনীতি।

আমরা যদি উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিংশ শতকের মধ্যাহ্ন পর্যন্ত মাথাপিছু কর্ষিত জমি ও মাথাপিছু উৎপাদনের হিসেব নিই তাহলে খুব ভয়াবহ ছবি ফুটে উঠবে। এই হিসেব অনুযায়ী দেখি ১৮৯১ সালে মাথাপিছু কর্ষিত জমির পরিমাণ যেখানে ছিল ১·০৯ একর ১৯৫১ সালে তা হ্রাস পেয়ে হয়েছে ০·৮৪ একর (Census 1951, Vol-part I A ; p. 141) এবং সঙ্গে সঙ্গে মাথাপিছু উৎপাদন হ্রাসের হারও লক্ষণীয় :

১৮৯৩-৯৬—১০০ ; ১৯১৬-২৬=৯৮ ; ১৯৩৬-৪৬=৮০ ;

(G. Blyn—The Agricultural Crops of India. 1893-96)

আবার ১৯৩৪-৩৯ সাল থেকে ১৯৪৬-৫১ সালে মোট কৃষি উৎপাদন শতকরা ৬ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। এই সময়ে কৃষি-উৎপাদন পদ্ধতিতে কৌশলগত বা সংগঠনগত উন্নয়নমূলক কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।

কৃষি অর্থনীতির বিশেষক্ষেত্রে উৎপাদন পদ্ধতি ও সংগঠনের যেমন পরিবর্তন ঘটেছে তেমনি উৎপাদনও লক্ষণীয় হারেই বেড়েছে। তামাকপাতা, চা, কফি, রবার, পাট ও তুলা প্রভৃতি বাণিজ্যিক ফসলের উৎপাদন ১৮৯০ থেকে

* আবদ্ধ অর্থনীতিক উন্নয়ন—Enclave Development.

১৯৪৮-৫৬ সালের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব ফসলের জন্য জমির ব্যবহারের পরিমাণের তুলনায় উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বেশি অর্থাৎ জমির সযত্ন ব্যবহার, উন্নত যন্ত্রপাতি ও কৌশলের নিয়োগ এবং উন্নত ধরনের সার ও বীজ ব্যবহারের ফলে এমন ঘটেছে। অর্থাৎ কৃষি অর্থনীতিতে পদ্ধতিগত যে উন্নয়ন ঘটেছে তাও বিশেষ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থেকেছে—তার প্রভাব কৃষির বৃহত্তর ক্ষেত্রে পড়েনি বা সেই প্রভাব আত্মস্থ করবার ক্ষমতা তাদের ছিলনা। অধ্যাপক ম্যালেনবমের উক্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : "Improvements in one are tending to spread slowly, if at all—response sequences are limited in the area as well as in the nation—more broadly rather gains here are offset by declines elsewhere." (Prospects for Indian Development)

ডঃ এস. আর সেন একটা মূল্যবান দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। আসামে দেখা যাচ্ছে চতুর্দিকে চাষী খামার (peasant-farming) বেষ্টিত অঞ্চলে বাগিচা চাষ প্রবর্তিত হয়েছে। অথচ উন্নত যন্ত্রপাতি ও আধুনিক কৌশলে পরিচালিত এই বাগিচা চাষ-পদ্ধতি নিকটবর্তী চাষী খামারের পদ্ধতিকে কোনো প্রকারে প্রভাবিত করতে পারেনি অর্থাৎ চাষী খামারগুলির উপর বাগিচা চাষ-পদ্ধতির কোনো demonstration effect হয়নি। বা ক্ষুদ্রায়তন ভিত্তিতে পরিচালিত প্রাচীন-পদ্ধতি অনুসৃত দুর্বল চাষী খামারের পক্ষে ঐ প্রদর্শনী প্রতিক্রিয়া দ্বারা উজ্জীবিত হবার প্রাণশক্তি ছিল না বলাটাই ভালো। ডঃ এস. আর সেন মহাশয় লিখেছেন : "There seems to be a chasm between the planters and their neighbouring farmers in Assam which has not yet been bridged.* এ উক্তি ভারতের কৃষি এলাকার এই ধরনের পরিস্থিতির সর্বত্রই প্রযোজ্য।

আমাদের দেশে কৃষি অর্থনীতির গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে কিন্তু শিল্পোন্নত দেশগুলির উন্নয়নের প্রাথমিক যুগের মতো সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মাথাপিছু কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির কোনো লক্ষণই দেখা দিল না। শুধু তাই নয়, গ্রাম এলাকায় শুধু কৃষিরই অবনতি ঘটেনি কৃষি-ভিন্ন অন্যান্য জীবিকারও শোচনীয়

* The Strategy of Agricultural Development—সর্বভারতীয় কৃষি অর্থনীতি সম্মেলন সভাপতির অভিভাষণ।

অবস্থা ঘটেছে। মাথাপিছু উৎপাদন হ্রাস যেমন একদিকে শ্রমের সময় বৃদ্ধি ঘটিয়েছে অপরদিকে কৃষকের সংখ্যাও বাড়িয়েছে। কৃষকেরা চাষবাসের জন্য যে সামান্য যন্ত্রপাতিও ব্যবহার করে তা তারা গ্রামের বাইরে থেকেই কিনত। অবশ্য ক্ষুদ্রায়তন ভিত্তিতে জনবহুল চাষ ব্যবস্থায় এই সামান্য যন্ত্রপাতির ব্যবহার তেমন সুফলপ্রসূ হয়নি আর তা হয়ও না। ফলে, গ্রামের কারিগরদের কোনো রকমে বেঁচে থাকবার মতো জীবিকাও বিশেষভাবে ব্যাহত হতে থাকে। তা ছাড়া, কৃষকদের দুরবস্থার দরুণ তাদের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় এদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে। এদের পণ্য গ্রামের বাইরে আমদানী করা বা উন্নত যন্ত্রপাতি তৈরী পণ্যের প্রতিযোগিতার সম্মুখে বিক্রীর কথাই ওঠে না। তাই এমন করেই গ্রামীন অর্থনীতিতে অচল অবস্থা স্থায়ী হয়ে উঠতে থাকে। কুমোর, কামার, তাঁতী, জোলা হস্তশিল্পীরা বৃহত্তর শহরাভিমুখী হয় অথবা অদক্ষ শ্রমিকে রূপান্তরিত হতে থাকে। অকৃষিগত গ্রামীন অন্যান্য উৎপাদনে মাথাপিছু হার দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। সেদিন কৃষি ছাড়া অন্যান্য জীবিকার সুযোগ যে কত সীমিত ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় ক্রমবর্ধমান কৃষি-শ্রমিকের সংখ্যার হিসেব থেকে। হিসেবটি নিম্নরূপ :

কৃষি-নির্ভর জনসংখ্যার অনুপাত :

১৮৮১—৬১% ; ১৯১১—৭১% ; ১৯৫১—৭০%

[এর সঙ্গে একটি উন্নত অর্থনীতির দেশ অর্থাৎ আমেরিকার অবস্থার তুলনা করা যেতে পারে—১৮৫০ সনে আমেরিকার কৃষি-নির্ভর মানুষের অনুপাত ছিল শতকরা ৬৪ ভাগ এবং ১৯৫০ সালে সেই সংখ্যা হ্রাস পেয়ে হয়েছে শতকরা ১০ ভাগ। আবার ১৮৫০ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে আমেরিকায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে দ্বিগুণ এবং কৃষি-নির্ভর জনের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে শতকরা ৫০ ভাগ।]

এ থেকে আমাদের কৃষি অর্থনীতির অচলাবস্থার পরিচয় পাই—অর্থাৎ অচলাবস্থা না ক্রমাবনতির অবস্থাই বলা চলে।

দেখা গেল ইংরেজ শাসনকালে অনুসৃত আর্থনীতিক কার্যক্রম সে সব দেশের আর্থনীতিক জীবনে গতিশীলতা সৃষ্টি করতে পারেনি বরং স্বাভাবিক আর্থনীতিক উন্নয়নের পক্ষে প্রতিবন্ধকগুলিকেই শক্তিশালী করেছে। বিদেশী শাসকদের কার্যক্রম ও বিধিব্যবস্থা ছাড়াও দেশীয় উদ্যোক্তা ও ফিনান্সিয়ারদের মনোভাবের মধ্যে দিয়েও এই প্রতিবন্ধকগুলি প্রকাশ পেয়েছে। বিদেশী ও

দেশী কারখানাজাত পণ্যের প্রতিযোগিতায় বিধ্বস্ত কারিগর ও কৃষকদের মধ্যেও প্রাথমিক ভাবে এই প্রতিবন্ধকের প্রতিক্রিয়াগুলি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। সীমিত কর্মসংস্থান সুযোগ শ্রমনিবিড়-অর্ধবেকার ভিত্তিক উৎপাদন (built in underemployment) কৌশলকেই উৎসাহিত ও স্থায়ী করেছে। যে ধরনের সীমিত শিল্পায়ন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতে আবদ্ধ উন্নয়নই ঘটেছে এবং ফলে কোনো উন্নয়ন-প্রবাহের (growth process) উদ্ভব হয়নি। তাই ক্রমাগতই নগর শহর শিল্প এলাকার শ্লথ গতি উন্নয়ন এবং প্রধানতই অচলাবস্থামূলক কৃষি অর্থনীতির পার্থক্য দুস্তর হয়ে চলেছে। আজও সেই ধারা অব্যাহত। একটা কথা ; শহর নগর এলাকা যত গতিশীলই হোক না কেন তার প্রসারসীমা কৃষি অর্থনীতির অচলতা দিয়ে যেমন আবদ্ধ তেমনি ভোগ্য পণ্য শিল্প ও ব্যবসায়ভিত্তিক শহর-নগর অর্থনীতির প্রকৃতিগত ধারা ও কৃষি অর্থনীতির জীবনে প্রাণসঞ্চার করতে অক্ষম।

এই অবস্থায় পল্লী ও নগরের মধ্যে পণ্য, শ্রম, ও ধারণাগত আদান প্রদানে প্রতিবন্ধকতা বৃদ্ধিই পায়—হ্রাস পায় না। গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চলের উৎপাদন ও সুবিধাগুলি দ্রুততালে গোটা অর্থনীতিতে পরিব্যাপ্ত করা যায় না। আবার সমাজ কাঠামো, সঞ্চয় প্রবৃত্তি, শ্রমিকের দক্ষতা ও ধারণা, মূল্য-যোগান সম্পর্ক প্রভৃতি সব কিছুতেই এই আবদ্ধ উন্নয়নের ছাপ থেকে গিয়েছে।

ইংরেজ আমলে বাগিচা, খনি, তৈল প্রভৃতি শিল্পে যে ধরনের অর্থ লগ্নী ভারতে হয়েছে তার প্রতিক্রিয়া ইওরোপের প্রথমাবস্থায় মূলধন লগ্নীর প্রতিক্রিয়ার মতো অনুকূল হয়ে ওঠেনি। কেননা, ঐ ধরনের মূলধন লগ্নীর শুভফল যেটুকুও ঘটেছিল তা দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আর্থনীতিক অগ্রগতির দিক দিয়ে শেষ পর্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি। অর্থাৎ যে আর্থনীতিক উদ্বৃত্ত ঘটল তা জনসংখ্যাবৃদ্ধিতে বাড়তি ভোগে ব্যয় হয়ে গেল মূলধনে রূপান্তরিত হয়ে শিল্পায়নে পুনর্বিনিয়োগ হল না। পশ্চিমের উন্নত অর্থনীতির দেশগুলিতে শিল্পায়নের প্রারম্ভে মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির অবস্থা দীর্ঘকাল সংরক্ষিত হয়েছিল যার ফলে জন্মহার হ্রাস পায় এবং তাতে আর্থনীতিক অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। অর্থাৎ এই ধরণের আর্থনীতিক ক্রিয়াকর্মে জনতত্ত্বগত (demographic reaction) যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে—যা ইওরোপে ঘটেছিল, তা এখানে ঘটল না। আজ পর্যন্ত শিল্পায়নের কার্যক্রম সেদিক থেকে ব্যর্থ হয়েছে। সেদিন কেন ব্যর্থ হয়েছিল আর আজও কেন হচ্ছে তার কারণ নিহিত রয়েছে

শিল্পায়ন পদ্ধতির প্রকৃতি এবং কৃষি অর্থনীতির প্রকৃত সংস্কার ও পুনর্গঠনের কার্যক্রমের অনুপস্থিতির মধ্যে।

ইংরেজ আগমনের প্রাক্‌কালে, এমন কি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাবস্থাতেও প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় ভারতের জনসংখ্যা বিপুল ছিল না এবং সেই দিক থেকে যন্ত্রশিল্প প্রসারের মাধ্যমে আর্থনীতিক উন্নয়নের পক্ষে এদেশের অবস্থা অনুকূলই ছিল বলা চলে। এবং যন্ত্রশিল্প প্রসারের ফলে কৃষি অর্থনীতির সংগঠন ও পদ্ধতিগত যে উন্নয়ন ঘটত তাতে আর্থনীতিক উন্নয়নের দিক দিয়ে জনতত্ত্বগত প্রতিক্রিয়া ইওরোপের মতই অনুকূল হয়ে উঠত।

কিন্তু ইংরেজ-অনুসৃত রপ্তানী-বাণিজ্যমুখী শিল্পায়ন-কার্যক্রম এবং তাদের প্রবর্তিত নতুন ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সম্পর্কের ফলে দেখা গেল ১৯ শতকের শেষ ভাগে ভারতবর্ষে জনসংখ্যাবৃদ্ধি এত দ্রুত হারে ঘটল যে শিল্পায়ন কর্মপদ্ধতি ও ভূমি-নীতি না বদলিয়ে অর্থাৎ—বৃহদায়তন কৃষি অর্থনীতি ও মূল ও ভারী শিল্প পত্তনের মাধ্যমে উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি না ঘটিয়ে শুধুমাত্র বাগিচা, খনি ও রপ্তানী শিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব না। শুধু তাই না, এই সব শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির শিল্প-কারখানা ভারতে গড়ে ওঠেনি বা গড়ে উঠতে দেওয়া হয়নি। ইংলণ্ড থেকে এসব যন্ত্রপাতি আমদানী করে বাগিচা, পাট, বস্ত্র শিল্পে যোগান দেওয়া হয়েছে। কাজেই এই ধরনের শিল্পায়ন কার্যক্রমের ফলে এবং ক্ষুদ্রায়তন কৃষি অর্থনীতির দরুণ যথার্থ নগরীকরণ (urbanisation) ঘটেনি। ইংলণ্ড, আমেরিকায় শিল্পায়নের প্রথম পর্বের শিল্পকরণ কর্মপদ্ধতির প্রকৃতির দরুণ নগরীকরণ সঙ্গে সঙ্গেই ঘটেছে—তাই নগরীকরণের জনতত্ত্বগত প্রতিক্রিয়াও ঘটেছে, যা ভারতবর্ষে ঘটল না। ইওরোপ-ইংলণ্ড-আমেরিকায় প্রাথমিক বিনিয়োগ, খনি, তৈল, ও রপ্তানীর জন্য কাঁচামাল উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ঘটেছিল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে বৃহদায়তন কৃষি অর্থনীতির পত্তন এবং সেকেণ্ডারি ও টারসিয়ারি শিল্পের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটেছিল। সেক্ষেত্রে ইংরেজ ঔপনিবেশিকরা ভারতে এই দুই ক্ষেত্রে অর্থাৎ সেকেণ্ডারি ও টারসিয়ারি শিল্পের বিকাশে উৎসাহ তো দেয়ই নি বরং বাধা সৃষ্টিই করেছে। কাজেই ভারতে শিল্পে-বিনিয়োগের সঙ্গে সংযুক্ত সেকেণ্ডারি ও টারসিয়ারি শিল্পের বিকাশ ঐ সব দেশে না ঘটে উপনিবেশিক শক্তি, ইংলণ্ডেই ঘটেছিল। ব্যাঙ্ক প্রভৃতি অর্থলগ্নীর কারবার (financing), যানবাহন সংগঠন ব্যবস্থা

(transporting) মজুত কারবার (storing) বীমা, শিল্পগত কাঁচামালের প্রসেসিং (processing industry) প্রভৃতি শিল্প ভারতের বাইরেই মূলত সংগঠিত হয়েছিল। যে শিল্পায়ন শুধু কাঁচামাল ও রপ্তানী বাণিজ্য পণ্য তৈরীর মধ্যে সীমাবদ্ধ তাতে নগরীকরণ ঘটে না এবং এই ধরনের শিল্পকর্ম ভারতের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষের একমাত্র জীবিকা কৃষি অর্থনীতিতে ধনতন্ত্রগত (capitalising) বা অন্য কোনো ধরনের উন্নয়নমূলক পরিবর্তন না ঘটিয়েই অনেকদূর অগ্রসর হতে পারে। এ থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি তা হল এ সব দেশে মৃত্যুর হার হ্রাসের শুরু থেকে জন্ম হার হ্রাস শুরু হওয়ার মধ্যে যে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান থাকে তা ভারতের বিশেষ ধরনের নগরীকরণ পদ্ধতি বিচ্ছিন্ন শিল্পায়ন কর্মধারা প্রভাবিত।

বিষয়টিকে অন্যভাবেও দেখা চলে। অর্থাৎ যে সব দেশে যে সময় থেকে যন্ত্রশিল্পগত অগ্রগতি সামাজিক ও আর্থনীতিক জীবন কাঠামোয় ব্যাপক ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে সব দেশে সেই মুহূর্ত থেকে শুধুমাত্র যে উৎপাদন ক্ষমতাই বৃদ্ধি পায় তা নয়, কিছুদিনের মধ্যেই সে সব সমাজে হ্রাসমান প্রজনতাও দেখা দেয়। ইংলণ্ড-ইওরোপের ইতিহাস তাই বলে। কিন্তু ভারতবর্ষ প্রমুখ দেশে অনুসৃত শিল্পায়ন পদ্ধতিতে built-in technological progress রূপায়িত হয়ে ওঠেনি। এসব দেশে নতুন উৎপাদন পদ্ধতি দেশী সমাজ-প্রয়োজন উদ্ভূত নয়; তাই এই সব সমাজে এই ধরনের শিল্পায়নের তেমন কোনো প্রভাব পড়েনি। এ সব দেশের অতি অল্পসংখ্যক লোকই আধুনিক যন্ত্রগত উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত ছিল এবং সাধারণ মানুষের অনুসৃত উৎপাদন পদ্ধতি এতে একটুও পরিবর্তিত হয়নি। কেন তা হল না? ভারতে যে ধরনের আর্থনীতিক ক্রিয়াকর্মে যে পদ্ধতিতে শিল্পায়ন ঘটেছে তাতে সেই অনুপাতে কর্মসংস্থান-সুযোগ বৃদ্ধি পায়নি। সেদিক থেকে ভারতের মতো উপনিবেশিক দেশগুলির আর্থনীতিক ক্রিয়াকর্মকে শিল্পক্ষেত্র (industrial sector) ও কৃষি ক্ষেত্র (rural sector) এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। শিল্প ক্ষেত্র বলতে রপ্তানীমুখী শিল্প; বাগিচা শিল্প, খনি, কিছু পাট ও বস্ত্রশিল্পকে বোঝায়; আর কৃষি ক্ষেত্রে খাদ্যশস্য উৎপাদন, হস্ত শিল্প ও অন্যান্য কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে ধরা চলে। শিল্প ক্ষেত্র মূলধন-নিবিড় পদ্ধতিতে পরিচালিত এবং এ সব শিল্পের উৎপাদন-উপাদান-সম্মিলন ঘটে অপরিবর্তনীয় অনুপাতে (fixed technical co-efficient) তা ছাড়া,

মূলধন-নিবিড়মূলক পদ্ধতিতে নিযুক্ত যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানীকৃত— দেশের মাটিতে দেশের শ্রম ও অন্যান্য উৎপাদনে তৈরী নয়। কাজেই সব মিলিয়ে এই সব উৎপাদন সংগঠনে বিনিয়োগের কর্ম-সংস্থানগত সুফল সামান্যই ঘটে। অবশ্য পল্লী অঞ্চলে উৎপাদনের উপাদান-সম্মিলন পরিবর্তনীয় অনুপাতে ঘটে (variable technical co-efficient) অর্থাৎ উপাদান-সম্মিলনের অনুপাতের ব্যাপক বিভিন্নতার সাহায্যে উৎপাদন এ সব ক্ষেত্রে সম্ভব।

এই অবস্থায় আর্থনীতিক বিকাশধারা প্রথম পর্যায়ে উৎপাদনের কোনো উপাদানের যোগানই তুলনায় প্রচুর বা স্বল্প কোনটাই হয় না। তাই উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে শিল্প পত্তনের ফলে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির দরুণ প্রজনন বিস্ফোরণ ঘটে। ক্রমশ শিল্প ক্ষেত্রে যে হারে মূলধন সংগঠিত হয় সে হারকে অতিক্রম করে যায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার। কারণ, এইসব শিল্পের যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানীকৃত এবং কেবলমাত্র কাঁচামাল আসে দেশের পল্লী অর্থনীতি থেকে ; আর তাছাড়া, কৃষি অর্থনীতিতে পুরাতন পদ্ধতিতে ক্ষুদ্রায়তন ভিত্তিতেই উৎপাদন চলে ; ফলে মাথাপিছু আয় স্বল্পই থাকে— মোট আয় বাড়াবার তাগিদে পরিবারের আকার বৃদ্ধির প্রবণতা তাই থেকে যায়। অপরদিকে এই সব দেশের শিল্পক্ষেত্রে অপরিবর্তনীয় উৎপাদনের সম্মিলনের ফলে জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পায় তাতে এই সব শিল্পের ক্ষেত্রে কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় না। শিল্পায়নের প্রথম প্রতিক্রিয়ার পর কর্মসংস্থান-সুযোগ কৃষি ক্ষেত্র থেকে শিল্পক্ষেত্রে স্থানান্তরিত তো হয়ই না বরং তুলনায় মোট কর্মসংস্থান হ্রাসের সম্ভাবনাই ঘটে। সেদিনের বিশেষ ধরনের শিল্প নীতি এর জন্য দায়ী।

স্বভাবতই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে অপর ক্ষেত্রে পল্লী আর্থনীতিক কাঠামোতে অর্থাৎ উপাদানের পরিবর্তনীয় সম্মিলনমূলক উৎপাদনের ক্ষেত্রে জীবিকার অন্বেষণ করতে হয় এবং যত দীনই হোক জমির আশ্রয় দেওয়ার ক্ষমতা অপরিসীম বটে। কৃষিতে মূলধনের যে পরিমাণ যোগান ঘটে থাকে তার অনুপাতে শ্রম উৎপাদন ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং যেহেতু পল্লী অর্থনীতিতে উৎপাদন-উপাদান-সম্মিলন পরিবর্তনীয় সেই হেতু উৎপাদন পদ্ধতি ক্রমশ শ্রম-নিবিড় হয়ে ওঠে আমাদের দেশে। প্রথমাবস্থা জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে ভূমি ও শ্রমের অনুপাত স্থির রাখতে গিয়ে নতুন জমি

অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু যেহেতু পাশাপাশি অনুষ্ঠিত শিল্পায়ন সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নমূলক নয় ও কৃষিকে উন্নত ধরনের মূলধন যোগানে অক্ষম এবং ভূমি রাজস্ব প্রথার দরুণ ক্ষুদ্রায়তন ভিত্তিতে পরিচালিত পঙ্গু কৃষি অর্থনীতি সেই হেতু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটি পরিবার কর্তৃক [illegible] কর্ষণযোগ্য জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ হয়ে ওঠে এবং তখন সেখানে যতদূর সম্ভব শ্রম-নিবিড় পদ্ধতি অনুসৃত হতে থাকে। এমন করে অত্যধিক শ্রম-নিবিড় পদ্ধতি অনুসরণের ফলে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন কোনোরকমে জীবনধারণ মানেরও নীচে নেমে যায়, এমন কি শূন্যেও পৌছয়। এই অবস্থায় প্রচ্ছন্ন বেকারের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়।

গত একশ বছর ধরে ভারতের মতো দেশগুলিতে কৃষিক্ষেত্রে এবং কুটির ও হস্তচালিত শিল্পে উৎপাদনপদ্ধতি ও সংগঠন-গত কোনো উন্নয়ন ঘটেনি বা সে চেষ্টাও হয় নি (কেন হয়নি পরে আলোচ্য) ; অথচ রপ্তানীমূলক শিল্পে বাগিচা ও খনি প্রভৃতি শিল্পের ক্ষেত্রে অধিক মজুরীতে সুদক্ষ শ্রম নিয়োগ ঘটেছে। ফলে দেখা গেছে, শিল্প-অঞ্চলের সন্নিহিত কৃষি এলাকার বাড়তি জন কোনো সুযোগ পেল না—দেশের ভিন্ন অঞ্চলের নগর শহর এলাকার শিক্ষিত সুদক্ষ জন সে ক্ষেত্রে নিযুক্ত হল। কাজেই গ্রাম ও শহর-নগর এলাকাগুলির ব্যবধান ক্রমাগত দুস্তর হয়ে উঠল। আজও সে ধারা অনেকটা অব্যাহত। দুর্বল, দরিদ্র, কৃষি অর্থনীতি অধ্যুষিত আর্থনীতিক কাঠামোতে শিল্পায়ন সীমিতই থেকে যায়। উন্নত ভোগ্যপণ্য শিল্পে প্রধান শিল্পায়ণই তাই আমাদের অর্থনীতিতে ঘটেছে—সামগ্রিক অর্থনীতিক উন্নয়নোপোযোগী ভারী ও মূল শিল্পপ্রসারের মাধ্যমে উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পায় নি।

এ প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কথাও উল্লেখযোগ্য—কেননা বৈদেশিক বাণিজ্য ইংরেজ আমলে ও আজও আমাদের অর্থনীতিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে। তবে এ কথা সত্য বর্হিবাণিজ্য সেদিন আমাদের আর্থনীতিক অগ্রগতির পক্ষে ক্ষতিকরই হয়েছিল। উনিশ ও বিশ শতকের প্রথম ভাগে আমাদের দেশে রপ্তানী বাণিজ্যের বেশ দ্রুততালে উন্নতি ঘটেছে। সেদিন রপ্তানী বাণিজ্যের ক্ষেত্রের মূলধন দুষ্প্রাপ্য ছিল না—রপ্তানী বাণিজ্যে নিয়োজিত বিদেশী ফার্মগুলি বিদেশ থেকে সহজেই সমান শর্তেই মূলধন ঋণ সংগ্রহ করতে পারত। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, রপ্তানী বাণিজ্যের অগ্রগতি

অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রে মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে গুণিতক প্রতিক্রিয়া (multiplier effects) সৃষ্টি করল না কেন? অর্থাৎ রপ্তানী বাণিজ্যের spread effects বা ব্যাপক প্রসারে সুফল ঘটল না কেন?

এর জন্য দায়ী, সীমিত শিল্পায়নপ্রসূত শ্রম যোগানের কয়েকটি অবস্থা। প্রথমত স্বল্প মজুরীতে বিপুল শ্রমের যোগান এবং দ্বিতীয়ত সাধারণত দক্ষ শ্রমিকের অভাবের দরুণ সংগঠকেরা উপযুক্ত পরিমাণে শ্রম সংগ্রহের বিষয়টিকে দুরূহ কাজ বলে মনে করতেন। শ্রমের মজুরী জীবনমানের দিক থেকে অল্প হলেও তাদের উৎপাদন ক্ষমতার তুলনায় তা অল্প ছিল না।

অবশ্য শস্তা শ্রম-নিয়োগ নীতির পরিবর্তে অধিক মজুরীতে সুদক্ষ শ্রম-নিয়োগ নীতি এবং শ্রমের পরিপূর্ণ ও যথার্থ ব্যবহারের নীতি অনুসরণ করতে হলে বড় যন্ত্রপাতির আকারে বিপুল একত্র নিয়োগ এবং অপর দিকে স্থায়ী শ্রমের উপযোগী কৃষি সংগঠন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন ছিল। যা সেদিন নেওয়া হয় নি।

ভারতে সেদিন বিদেশী ব্যবসায়ীরা, বাগিচা, রপ্তানী প্রভৃতি কৃষির ক্ষেত্রে শস্তায় শ্রম-নিবিড় পদ্ধতির অনুসরণের পক্ষপাতীই ছিল—এতে সহজলভ্য শ্রমের ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যয় সংক্ষেপ ঘটত—তা ছাড়া, এই ক্ষেত্রেও নিপুণ দক্ষ শ্রমিকের নিয়োগ ঘটাতে গেলে অর্থনীতিকে ঢেলে সাজাতে হত—যা তাদের স্বার্থবিরোধী ছিল। কাজেই তারা সে পথে যায় নি। এ সব উৎপাদনের অপরদিকে অর্থাৎ যেখানে সুদক্ষ শ্রম ও উন্নত মূলধন অপরিহার্য সেখানে তার বিনিয়োগে এরা পেছপা হয় নি। অবশ্য এই মূলধন আমদানীকৃত ছিল এবং শ্রমেরও একটা অংশ তাদের স্বদেশাগত ছিল। তাই একই বাগিচা শিল্পের ব্যাপারে আমরা দেখি খুব সামান্যই সাধারণ ট্রেনিং প্রয়োজন এমন শ্রম-ও-ভূমি-নিবিড় পদ্ধতি সম্বলিত কৃষি অংশের সঙ্গে সুদক্ষ শ্রমসহ মূলধন নিবিড় পদ্ধতি অনুসৃত উৎপাদনের প্রসেসিং অংশ সংযুক্ত। ডঃ মিণ্ট লিখেছিলেন—It is the intermediate kind of technique requiring fairly large number of workers in skilled occcupation which were shunned by entreprenneurs in under-developed countries.

এ কথা স্বীকার করতেই হবে, উন্নত অর্থনীতির দেশগুলি অনুসৃত

শিল্পায়ন পদ্ধতি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে আর্থনীতিক অগ্রগতির পক্ষে বিপুল উৎসাহ উদ্যম সৃষ্টি হয় অথচ ভারতের মতো অনুন্নত অর্থনীতির দেশগুলিতে বিশেষ ধরনের সীমিত শিল্পায়ন কর্মধারা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নতুন অভাব সৃষ্টি করা ছাড়া শিক্ষাগত ও উন্নয়নমূলক কোনো প্রভাবই সৃষ্টি করতে পারে নি। বিদেশী শাসকের স্বার্থে আধুনিক যানবাহন ব্যবস্থার পত্তন ছাড়া কিবা কৃষি কিবা অকৃষি কোনো ক্ষেত্রেই উৎপাদন পদ্ধতি ও সংগঠন ও দক্ষতার দিক থেকে বৈপ্লবিক কোনো পরিবর্তন চোখে পড়ে না। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তাগিদে কৃষিক্ষেত্রে বিশেষায়ণ ঘটে প্রাচীন পদ্ধতিতে পুরনো অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন ফসল উৎপাদনের মধ্যে দিয়ে।

পূর্বে বলেছি, সেদিন আমাদের আর্থনীতিক ক্রিয়াকর্ম প্রধানত রপ্তানী বাণিজ্যমূলক শিল্পে বাগিচা, খনি প্রভৃতি শিল্পক্ষেত্রে ও কৃষিক্ষেত্রে বিভক্ত ছিল। এর ফলে আঞ্চলিক বৈষম্যও সৃষ্টি হয়েছে। অগ্রসরমান অঞ্চলগুলি কেন্দ্রীভূত আকর্ষণ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের আর্থনীতিক উন্নয়নের হার বৃদ্ধি করে এবং তাতে অনগ্রসর অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান অচলাবস্থা অথবা অবনতির সৃষ্টি করে। ক্ষীণ ব্যাপকপ্রসারী সুফল (weak spread-effects) সম্বলিত নিম্নমান আর্থনীতিক অগ্রগতিতে বাজারের প্রতিযোগী শক্তিগুলির চক্রাকার প্রতিক্রিয়ার ফলে সব সময়ের জন্য অঞ্চলগত অসাম্য সৃষ্টির (regional disparitis) দিকে একটা প্রবণতা থাকে এবং এই প্রবণতা আপনা থেকেই আর্থনীতিক অগ্রগতিকে ব্যাহত করে। উন্নত দেশের অর্থনীতির উচ্চমান অগ্রগতি ব্যাপক-প্রসারী সুফলকে অবশ্যই শক্তিশালী করে এবং অঞ্চলগত বৈষম্য সৃষ্টির প্রবণতাকে ব্যাহত করে। এর ফলে আর্থনীতিক অগ্রগতি সংরক্ষিত হয়।

অর্থাৎ নির্দিষ্ট কতকগুলি মূলধন নিবিড় উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমদানী করা মূলধন কেন্দ্রীভূত হওয়ায় আজকের এই অচল অবস্থা এবং এর ফলে সীমিত নগরীকরণ প্রভাব সৃষ্টি হয়ে নগর ও গ্রামের মধ্যে দুস্তর পার্থক্য গড়ে উঠেছে। এবং তা আজকে ভারতে সত্যিকারের উন্নয়নমূলক শিল্পায়ণের পক্ষে বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্বাধীনতার উত্তরকালে অবশ্য আমরা পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যাপকপ্রসারী শিল্পায়নের চেষ্টা নিয়েছি। কিন্তু পরিকল্পনার গত ১২ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে

দেখা যাচ্ছে; গ্রাম-নগরের পার্থক্য সমান দুস্তরই থেকে গেছে কিংবা উৎপাদন পদ্ধতির দিক থেকে কিংবা ভোগ সঞ্চয় কাঠামোর দিক থেকে। বলাবাহুল্য এই কারণে আর্থনীতিক উন্নয়ন-শক্তি যেটুকু সৃষ্টি হচ্ছে, তা সর্বব্যাপী না হয়ে বড় বড় শহর-নগর এলাকার বিশেষ ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠছে। আজও দেখা যাচ্ছে, শিল্পায়নের উন্নয়নমূলক প্রতিক্রিয়া গ্রাম এলাকায় অতি সামান্যই ঘটছে। আজও তাই শিল্পোন্নত বড় বড় শহরের পাশেই অনুন্নত গ্রাম এবং আজও এই গ্রামে দেশের শতকরা ৭০ ভাগ লোকের জীবিকার স্থান। অথচ যেখানে বড় বড় শহরের বিশেষ অঞ্চলে জীবনযাত্রার মান প্রায় মার্কিন জীবনযাত্রার সমতুল্য সেক্ষেত্রে গ্রামের লোকের মাথাপিছু আয় কোনোরকমে বেঁচে থাকার পর্যায়ভুক্ত যাদের মাসের মধ্যে প্রায় ১০ দিন অর্ধভুক্ত থাকতে হয় (সম্প্রতি The Statesman কাগজে প্রকাশিত রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)। উৎপাদন কাঠামো বিচার করলে দেখা যাচ্ছে, উন্নতমান ভোগ্য পণ্যের শিল্পে বিপুল মূলধন বিনিয়োগ ঘটছে অথচ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির শিল্প ভারী ও মূল শিল্পে সেই পরিমাণ বিনিয়োগ ঘটছে না। সেই একই ধারা অর্থাৎ একদিকে মুষ্টিমেয় শহর-নগর এলাকায় মূলধন নিবিড় পদ্ধতিতে উৎপাদন চলছে এবং অর্থনীতির অপরদিকে ক্ষুদ্রায়তন ভিত্তিতে শ্রমনিবিড় পদ্ধতিতে উৎপাদনের কাজ চলছে। অর্থাৎ দ্বৈত অর্থনীতি অনুসৃত হচ্ছে—তাই সত্যিকারের আর্থনীতিক অগ্রগতির কাজ ব্যাহত হচ্ছে।

ঐ প্রসঙ্গে কৃষি অর্থনীতির সংগঠন ও উৎপাদন পদ্ধতির আলোচনা করাটা বিধেয়। লক্ষ্য করবার বিষয়, ইংরেজ আমল থেকে পরিকল্পনা কাল পর্যন্ত কৃষি অর্থনীতি অনুসৃত নীতির তেমন কোনো মৌলিক পরিবর্তন চোখে পড়ল না। সম্প্রতি ভূমিসংস্কার নীতির আশ্রয় আমরা নিয়েছি সত্য কিন্তু তাতে জমিতে কৃষকদের মালিকানা স্বীকৃত হলেও উৎপাদন ব্যবস্থা ও সংগঠন-মূলক এবং উৎপাদন সম্পর্কগত কোনো ব্যাপক পরিবর্তন চোখে পড়ে না। তার ফলে কৃষি অর্থনীতির অনুন্নত অবস্থা প্রায় স্থায়ী হয়ে উঠেছে। ইংরেজ আমলে অনুসৃত নীতির প্রতিক্রিয়া আজও ব্যাপকভাবে আমাদের কৃষি অর্থনীতিতে উপস্থিত।

এ প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। প্রথমত ভূমি-প্রথার বিবর্তনের মাধ্যমে ইংরেজ আমলে মধ্যবর্তী সত্তা জমিদার শ্রেণীর এবং জমিতে অচাষী শ্রেণীর মালিকানার প্রবর্তন। এর ফলে, চাষীকে জমির সঙ্গে বেঁধে ফেলা

হল। কেননা তার পক্ষে অন্য কোনো বৃত্তির অভাবে চাষ, তা যত অলাভ-জনক শর্তেই হোক, ছেড়ে যাওয়ার উপায় রইল না—ফলে ভূস্বামী জমিদার শ্রেণীদের শোষণের সুযোগ ব্যাপক হয়েছিল। চাষীর ভূমিহীনতা আর্থনীতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে অত্যন্ত ক্ষতিকর ভবিষ্যতের ইঙ্গিত করল। জমি থেকে চাষীর বিতাড়িত হবার শঙ্কা থাকায় চাষীর পক্ষে জমির মালিকের সঙ্গে ফসলের ভাগাভাগি নিয়ে সুবিধেমতো দরকষাকষির ক্ষমতা সীমিত হয়ে গেল এবং এই অবস্থায় জমিতে দীর্ঘকালীন মূলধন লগ্নীর মাধ্যমে জমির উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি কোনো ঝোঁকও চাষীর থাকবার কথা নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত কৃষি থেকে অন্য বৃত্তিতে যাওয়ার সুযোগের অভাব বা বাধা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত স্বভাবতই নতুন ভূমি-ব্যবস্থাতে উৎপাদনের দিক দিয়ে অসুবিধা-জনক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিতে অকেজো পদ্ধতিতে (inefficient methods) চাষবাসের প্রবণতা বৃদ্ধিই পাবে। আজও ভূমিসংস্কারের পরও ভূমি সংগঠনের অভাবে এবং ব্যাপক শিল্পায়নের অভাবে এই প্রবণতা শক্ত হয়েই থেকে গিয়েছে। কৃষির capitalisation-এর অভাবও এর একটি কারণ।

সেদিন দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখা দিয়েছিল কৃষিপণ্য—বিশেষ করে রপ্তানী পণ্য ও বাণিজ্যিক পণ্যের বিক্রির ব্যাপারে মধ্যবর্তী স্বত্বের (intermediaries) আবির্ভাব সত্যিকারের চাষীকে ন্যায্য উপার্জন থেকে বঞ্চিত করেছে। কৃষকের সঙ্গে এই মধ্যবর্তী স্বত্বের আগাম চুক্তির ফলে বাজারে মূল্য স্থির হবার সময় যে সুবিধে ঘটে তা থেকে কৃষক বঞ্চিত হয়। অসংগঠিত কৃষি অর্থনীতিতে এই মধ্যস্বত্বশ্রেণী কৃষকদের উৎপাদনকালে জীবিকা নির্বাহের জন্য খাদ্যবস্তু বা বীজ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে এবং তার ফলে পণ্য বিক্রয়ের আয় থেকে সর্বাধিক সুবিধে ভোগ করে এবং এইভাবে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা এমনকি বাণিজ্য ফসলের উৎপাদন ও অমুদ্রাগত বিনিময়-ভিত্তিক থেকে গিয়েছে। আর এই কারণে কৃষি অর্থনীতি ক্রমাগত শহর-নগর এলাকার মুদ্রাগত বিনিময়-ভিত্তিক অর্থনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আজও একথা সত্য।

এ-সব দেশের সওদাগর-ব্যবসায়ীদের কাজকর্ম মহাজনদের কাজকর্মের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে মিশে আছে। "The narrow money margins which characterised the endevours of, most peasants meant

frequent borrowing repayment constituing a long-term burden which in itself deferred investment by many of the cultivators." (Malenbaum) তৃতীয়ত গ্রাম এলাকায় দুস্তর আর্থনীতিক বৈষম্য ও ভূমিগত সম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে ক্রমাগত কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রতিক্রিয়াও কৃষি অর্থনীতির অচলতার জন্য অনেকখানি দায়ী। যেখানে পল্লীগত অর্থনীতির মাথাপিছু উৎপাদন হার নিম্নমুখী সেক্ষেত্রে পল্লী মানুষের আর্থনীতিক কল্যাণ নির্ভর করে বহির্জগতের সঙ্গে তার লেনদেন ব্যবসা-বাণিজ্যের শর্তের উপর। আর একথাও আমরা জানি যে অর্থনীতির বৃহত্তম অংশ অমুদ্রাগত বিনিময়-ভিত্তিক (১৫% মাত্র মুদ্রাগত বিনিময়-ভিত্তিক—সাম্প্রতিক হিসেব অনুযায়ী) ফলে উৎপাদক তার পণ্যের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়ে দিনের পর দিন দারিদ্র্যের মধ্যেই দিন যাপন করে চলেছে। আর এই মুষ্টিমেয় ব্যবসায়শ্রেণী যারা লেনদেনের শর্তে লাভবান হল তাদের জমিতে লগ্নীর ব্যাপারে কোনো উৎসাহই থাকতে পারে না—আর জমিদার মহাজন শ্রেণী ও ব্যবসায়ী শ্রেণীরা এই প্রকারে যে বিপুল পরিমাণ বিত্তলাভ করেছে তা তারা শহর-নগর এলাকায় বিনিয়োগ করেছে। ফলে গ্রামের আর্থনীতিক উদ্বৃত্ত কৃষি উন্নয়নের জন্য লগ্নী না হয়ে ক্রমাগত শহর-নগর এলাকায় ফাটকা, গৃহনির্মাণ ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের শিল্পে বিনিয়োগ হয়েছে। এর ফলে পরিবর্তনশীল শহর-নগর এলাকা থেকে ক্রমশই বৃহত্তর পল্লীসমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে। দেখা গিয়েছে যোগাযোগ ও যানবাহনের উন্নতির ফলে শহর-নগর এলাকার ভোগকাঠামো হয়তো এদের ভোগকাঠামোকে কিঞ্চিৎ প্রভাবিত করেছে কিন্তু তাতে অন্যান্য উন্নত দেশের এই demonstration effect যেভাবে capital formation ও শিল্পায়নকে প্রভাবিত করেছে, ভারতে তা করেনি বরং সেদিক থেকে ক্ষতিগ্রস্তই করেছে। কেননা পল্লী অঞ্চলে দুর্বল কৃষি-অর্থনীতি-আশ্রয়ী কোনো রকমে বেঁচে থাকা মানুষের পক্ষে কৃষি-আর্থনীতিক সংগঠনের কোনোরূপ পরিবর্তন না ঘটিয়ে এই অবস্থার সঙ্গে সে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে না। অর্থাৎ শহর-নগর এলাকার উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি কৃষি অর্থনীতির উৎপাদন ক্ষমতা না বাড়ানো যায় তাহলে উভয়ক্ষেত্রের পারস্পরিক লেনদেনের ভিত্তিতে সমতালে আর্থনীতিক অগ্রগতি ঘটবে না—দুর্বল পল্লী অর্থনীতি সর্বদাই পেছিয়ে থাকবে। ফলে শিল্পের উৎপাদন কাঠামোও শুধুমাত্র শহর-নগর এলাকার উচ্চবিত্ত মানুষের

ক্রমবর্ধমান ভোগপণ্যের চাহিদা মেটাবার দিক থেকে তৈরি হতে থাকে। এতে একদিকে ভারী মূলশিল্প পত্তনের তাগিদ হ্রাস পেয়ে যন্ত্রপাতি আমদানীর উপর ক্রমশ নির্ভরশীলতা বাড়বে এবং শহর-নগর অর্থনীতির ও গ্রামীন অর্থনীতির মধ্যে ব্যবধান ক্রমশই দুস্তর হতে থাকবে। আমাদের গত ১০ বছরের অভিজ্ঞতাও এই কথার সত্যতা প্রমাণ করেছে। অর্থাৎ দুটি পরিকল্পনা অতিক্রান্ত হবার পরও দেখা যাচ্ছে কৃষি-আশ্রিত মানুষের সংখ্যা আমাদের দেশে বৃদ্ধিই পাচ্ছে। এবং এই কৃষি হল ক্ষুদ্রায়তন ভিত্তিতে প্রাচীন পদ্ধতিতে পরিচালিত স্বল্প মাথাপিছু উৎপাদনশীল কৃষি। একটা লক্ষ্য করবার বিষয়, আমাদের পল্লী অঞ্চলে কমিউনিটি উন্নয়ন-পরিকল্পনা কোনো উদ্যম ও উদ্যোগ সৃষ্টি করতে পারে নি—কিছু অঞ্চলে মুদ্রাগত বিনিময় ব্যবস্থা হয়তো এতে প্রসার লাভ করেছে কিন্তু তাতে ক্ষতি ছাড়া লাভ হয় নি—কেননা তাতে ক্ষতি সামান্য হলেও কিছু আধুনিক ভোগপণ্যের বাজার প্রসার ঘটলেও উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নি। এতে কমিউনিটি উন্নয়ন পরিকল্পনার দোষ নেই—দোষ মূলে অর্থাৎ, কৃষি-অর্থনীতির সংগঠনগত ও উৎপাদনপদ্ধতিগত কোনো উন্নয়ন না ঘটলে কমিউনিটি প্রজেক্টের কোনো আবেদনই পল্লী মানুষের কাছে থাকতে পারে না। সম্প্রতি The Statesman-এ প্রকাশিত Visva-Bharati Agro-Economic Research Centre-এর এক বিবরণী থেকে এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়।

ভারতের আর্থনীতিক উন্নয়নের হার বৃদ্ধি করতে হলে এবং শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি অর্থনীতিতে উন্নয়ন ঘটাতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন কৃষি-আশ্রিত মানুষের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি ও তার ফলে তাদের উপার্জন বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করা। অন্যান্য দেশে দেখা গিয়েছে শিল্পায়ন অগ্রগতির পক্ষে প্রয়োজনীয় উদ্বৃত্ত কৃষি অর্থনীতি থেকেই এসেছে এবং কৃষি-অর্থনীতির এই সার্থকতা আবার শিল্পায়ন অগ্রগতির ফলেই ঘটেছে কৃষি-অর্থনীতির উৎপাদন-পদ্ধতি ও সংগঠনের উৎপাদনের মাধ্যমে। আমাদের দেশে এমনটা ঘটল না। একটা কারণ শিল্পায়ন পদ্ধতির ত্রুটি যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে এবং অপরটি হল ভূমিসংস্কার নীতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষি অর্থনীতির উৎপাদন পদ্ধতি ও সংগঠনগত আমূল পরিবর্তনের কোনো চেষ্টার অভাব। ভূমিসংস্কারের ফলে কৃষকের হাতে জমি এসেছে কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ জমির মালিকানার সর্বোচ্চমান ব্যবস্থার ফলে জমির বড় অংশই পূর্বের মতো মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে থেকে

গেল।* কৃষি জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশের হাতে খুব সামান্য জমিই রইল। ফলে ক্ষুদ্রায়তন ভিত্তিতে প্রাচীন পদ্ধতিতেই চাষবাস চলছে ; আর তাই প্রচ্ছন্ন বেকার সমস্যাও থেকে গেল আবার উৎপাদন হারও কমল বই বাড়ল না। এরপর যে জমি রইল তা পাওয়ার কথা ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের—কিন্তু দেখা গেল তাদের কপালে এতই সামান্য জমি এসে দাঁড়াল যা একত্রিত করে সমবায় প্রথা অনুসরণের পক্ষে খুব লাভজনক মনে হল না। তাছাড়া পূর্বে বর্ণিত মহাজন মধ্যবর্তী শ্রেণী ব্যবসায়ীচক্র থেকেই গেল—ফলে অবস্থা যথা পূর্বং তথা পরং-ই থেকে গেল। কাজেই দেখা যাচ্ছে একদিকে শিল্পায়নের গতি উচ্চমান ভোগ্যপণ্য উৎপাদনমুখী এবং অপরদিকে কৃষি-অর্থনীতির আশ্রিত মানুষের ক্রমবর্ধমান দুর্দশা। ফলে উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র আজও স্থাপিত হল না।

* এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার জন্য :

(ক) Daniel Thorner—Agrarian Prospects in India

(খ) Agro-Economic Research Centre, Delhi-এর রিপোর্ট ও National Sample Survey Report দ্রষ্টব্য

(গ) প্রিয়তোষ মৈত্রেয়—Economics of Land Reforms in India—বিশ্বভারতী Agro-Economic Research Centre-এর Seminar পঠিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

গোপাল হালদার

রূপনারানের কূলে

(পূর্বানুবৃত্তি)

প্রবাসীর ভগ্নাসন

ফেনী কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের ক্লাস চলেছে। পড়াতে পড়াতে চোখে পড়ল ক্লাশের এক কোনে গুটি দু তিন ছেলে গল্প করছে। দেখে চিত্ত সরস হবার কথা নয়। ক্লাসের পড়া থামিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—কী কথা হচ্ছে। ধরা পড়ে ছাত্র কয়টি সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে! শেষ পর্যন্ত সলজ্জ ভাবে জানাল, "কথা হচ্ছিল, আপনার বাড়ি কোথায় ?"

এবার কৌতুক বোধ করলাম। বললাম, "তোমরাই বলো না কোথায় ?" সংকোচ আরো একটু কাটলে একজন বললে, "আমি বলছিলাম বিক্রমপুর, ঢাকা।' আমার বন্ধু বলছিলেন "নোয়াখালি। তর্ক হচ্ছিল—কার কথা সত্যি।" দুজনারই কথা—আমি তাদের 'গাঁওকী ভেইয়া'। বললাম "দুই-ই সত্য, দুই-ই মিথ্যা। ছাখো আমি জন্মেছি বিক্রমপুরে। আবাল্য কাটিয়েছি নোয়াখালি শহরে। তা জন্মক্ষেত্র নয় ; কিন্তু নিশ্চয়ই সেই বাসাবাড়িও বাড়ি। তাই দুটি কথাই সত্য। তবে আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করো তা হলে বলব আমার বাড়ি অন্যত্র।" ওদের কৌতূহলটা আরও একটু বেড়ে গেল। বললাম, "জানো ইউরোপে একটি কথা আছে, 'প্রত্যেক ইউরোপীয়ের দুটি আছে বাড়ি—একটি তার জন্মভূমি, আরেকটি প্যারিস।' আমার মতে আমাদের বাঙালীদেরও দুটি করে আছে বাড়ি। একটি নিজ বাড়ি, আরেকটি কলকাতা। আমি কলকাতার মানুষ।"

তখনো বয়স ছিল ত্রিশের নিচে। তা পেরিয়ে গিয়ে বক্সা বন্দিশালায় বাস করছি। তখন সেখানকার মধ্যবিত্ত কমিউনিস্টদের 'ভদ্রলোক'-বিরোধিতাকে নিরস্ত করবার মতো আমারও একটা উত্তর ছিল ; "আমি কমিউনিস্ট হব আবার কী ? আমি পুরুষানুক্রমে প্রোলেটেরিয়ান্—আপনারা

কেউ যা নন। আমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাই। জমিজমা দূরে থাক বাড়িঘরও আমাদের নেই। বিক্রমপুরের বাড়ি পদ্মা গর্ভে; নোয়াখালির বাসাবাড়ি—মেঘনার উদরে। থাকি কলকাতায়—ফ্লাটের ভাড়াটে। সম্বল শুধু দেহ আর মাথা। বাঙালী ভদ্রলোকরা তো have nothing to lose but their body and brains.”

গ্রামের সেই বাড়ির সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটত স্বল্পকালীন। সাধারণত পূজায় প্রবাসীরা বাড়ি যায়। প্রতি বৎসর সমস্ত পরিবারের বাড়ি যাওয়া আমাদের দিনে সম্ভব হত না, দু বৎসরে যেতাম একবার করে। তা হলেও, সেই বিক্রমপুর সমাজই ছিল সমাজ, বিবাহাদি ক্রিয়াকর্ম হয় সে সমাজেই। সেখানকার আচার-বিচারই বরাবর পরিবারের আচার-বিচার, তার ভাষা বাড়ির সকলের ভাষা, তার রন্ধন-রীতিও আমাদের স্বাভাবিক রন্ধন-রীতি। নিশ্চয়ই শিক্ষা-দীক্ষা ও বাইরের মেলামেশায়ও কিছুটা পলি পড়েছে সেই প্রবাসের মনে। গ্রামের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ স্বল্পকালের বলেই স্মৃতিতেও সুমধুর হবার পক্ষে তার বাধা ঘটে নি।

পূজার বাড়ি সহজ ভাবেই উৎসব-মুখর, আত্মীয় কুটুম্ব মিলনোচ্ছল, সমাদরে সম্ভাষণে মানুষের মুখ উজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত। নৌকার পর নৌকা তখন বাড়ির ঘাটে লাগছে। এলেন বুঝি পিসিমা তার কন্যা ও দৌহিত্রদের নিয়ে। অন্য গ্রাম থেকে এলেন এক ভাগ্নী বালবিধবা—মামাদের বাড়িই তো তার নিজ বাড়ি। বৃদ্ধা গৃহিণীর ভাই-ঝি এলেন কেউ ছোট পুত্রবধূকে নিয়ে—এই দাদাশ্বশুরের বাড়ি দেখে যাক নতুন বউ। পিসতুত ভাইরা এল কেউ—মা না থাকুন এই তাঁদের মামার বাড়ি। আর বাড়ির কন্যারাও এল—যাদের বাড়ি পূজা নেই—পিত্রালয়ে, দু-একটি ছেলে-মেয়ে নিয়ে—গৌরী যখন আসছে মায়ের কাছে। এদিকে পূজা মণ্ডপে প্রতিমা কাদামাটি থেকে দেখতে দেখতে অপূর্ব শ্রীতে প্রকাশিত হয়ে ওঠে বাতে-বাঁকা নসী কুমোরের সেই যাদুকর্ম দেখতে দেখতে আহার-নিদ্রা ভুলে যেতে হত। অধিবাসের আগেই খালের দিকে হঠাৎ ঢাক বেজে উঠল—রসিক 'ঋষি' জানিয়ে দিত সে এসে গিয়েছে। ঢোল কাঁসি ঢাকে এক দফা আগমনী ঘোষণা তখনি হল। অমনি মনে হল—পূজো বাড়ি! বাইরের প্রাঙ্গন লোকজনে জমাট। সন্ধ্যায় এসিটেলিন গ্যাসের আলোতে খাল পাড় পর্যন্ত আলো হয়ে উঠেছে! ভেতরে মেয়েদের কাজের অন্ত নেই—

কথারই কি শেষ আছে? বৎসরের জমানো কথা উছলে পড়ছে। কিন্তু পূজার কাজও তো কম নয়। আয়োজনও সম্বৎসর ধরে করতে হয় কত ভাবে। প্রসাদ বণ্টনের ও নিমন্ত্রণ রন্ধনের পর্ব। রাত জেগে বাটনা-বাটা কোটনা-কোটা থেকে ঝাড়াই-বাছাই কত কিছু। এ-পাড়ার ও-পাড়ার লোকজন প্রতিমা দেখতে আসে, প্রসাদ নিয়ে যায়। মুসলমান গ্রামবাসীরাও আসেন 'ঠাকুর' দেখতে সকলেরই আগ্রহ। নানা বাড়ির প্রতিমার তুলনাও শুনি তাদের মুখে—কোন বাড়ির প্রতিমা বড়ো। অসুরের রূপ কিরূপ। আমাদের বাড়ির প্রতিমা মাঝারি গোছের। মুখশ্রী ছিল লাবণ্যময়—নসী কুমোরের কৃতিত্ব অতুলনীয়। মুখশ্রীতে যে লাবণ্য তার তুলনা নেই। আবার প্রতিমা সত্যিই মাতৃ-মহিমায় প্রসন্নোজ্জ্বল দেখাতেন। বিজয়ার দিনে শেষ প্রহরে যখন নিঃসন্তানা 'বড়ো মা' দেবীর মুখ আঁচলে মুছিয়ে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলতেন, 'মা, আবার এসো, তখন সেই গৃহকর্ত্রীর চোখের জলে ও রুদ্ধ কণ্ঠের স্পর্শে ওই দেবী প্রতিমার মুখে আবার ফুটে উঠত বাড়ির মেয়ের মুখের মতোই মমতা-ভরা কথা। আমরা ছোটরা বলতাম—দেবী পিত্রালয় ছাড়তে কাঁদছেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম পাড়া প্রতিবেশীরা এসে গিয়েছে। মেজ জ্যাঠামহাশয় ও বাড়ির লোকজন সকল মিলে প্রতিমা খালের ঘাটে নামিয়ে দিলেন। খুব সাবধান—অঘটন না ঘটে। বিসর্জন হল। চললেন সকলে প্রতিবেশী স্বাহিত বাড়িতে—তাঁদেরও প্রতিমা বিসর্জনে সহায়তা করতে হবে। আমরা ছোটরাও পিছনে পিছনে ছুটে যাই। প্রতিমা বিসর্জন হয়ে গেছে। চললেন পাশের পাড়ার কামার বাড়ি—তাঁদের প্রতিমা বিসর্জনের পালা এবার। একে একে সকল বাড়ির প্রতিমা বিসর্জন হল। সকলেই সকলের সহকারী। সব শেষে বাড়ি ফিরে দেখতাম—বাড়ি শান্ত, সব যেন নীরব ; শূন্য মণ্ডপ বিষাদমগ্ন। সেখানে একটি মাত্র দীপশিখা জ্বলছে। অবশ্য বিজয়ার আলিঙ্গন-প্রণাম-আশীর্বাদের মধ্য দিয়ে আরম্ভ হয়েছে আর এক পর্ব উৎসব! বাঙালীর বিজয়ার তুলনা নেই—পর্ব উৎসবের তা পরম পরিণতি। দুর্গোৎসব ছাড়া বাঙালী জীবন রিক্ত হয়ে পড়বে কিনা জানি না। পূজো ছাড়াও বিজয়া শ্রীহীন হবে না। কিন্তু বিজয়া ছাড়া পূজো শ্রীহীন কেন, প্রাণহীন হয়ে যাবে। বাড়ি গিয়ে সকলের সঙ্গে বিজয়ার প্রীতি-বিনিময় করতে করতে কেমন করে অনুভব করি—আমরা শুধু একার নই, কত লোকের সঙ্গেই না আমাদের আত্মীয়তা। সন্ধ্যায় পুরোহিত ঠাকুর মহাশয় শান্তিজল নিতে ডাকেন। সার বেঁধে সবাই বসি—বড়র পরে

ছোট একে একে। জল ছিটিয়ে দিতে দিতে তিনি মন্ত্র পড়েন—'সম্বৎসরান্তে পুনরাগমনায় চ'। নিজেদের কথা ভেবে আমরা বলি 'দ্বিবৎসরান্তে—'।

গ্রামের বাড়ির সব থেকে বড় আকর্ষণ 'নৌকাখণ্ড' বর্ষান্তে জলে জলময় বিক্রমপুর। এবাড়ি-ওবাড়ি যাতায়াত নৌকায়। হাট-বাজার দেখা-সাক্ষাৎ নৌকা ছাড়া গতি নেই। প্রত্যেকের ঘাটে থাকে নিজেদের ডিঙা। তা না বাইতে জানে এমন লোক নেই। আমরা প্রবাসে থাকি, তা শিখি নি। প্রচণ্ড লোভ তাই নৌকা চালনায়। যখনি সুযোগ পাই চুরি করে ঘাটের নৌকা নিয়ে পালিয়ে যাই বাড়ির পিছনেই জলে-জলময় মাঠ। সাঁপলা, জলের দাম, নানা পাতায় তা ভরতি—দূরে দেখা যায় গ্রামের সীমানা, আর দিকে গাছে ঢাকা ভিন্ন গ্রাম। দু-তিনজনায় মিলে লগি ঠেলে, বইঠা বেয়ে সে দিকে এগিয়ে যেতে যেতে আবার কেমন ভয়-ভয়ও করে—ফিরে আসতে পারব তো ঠিক মতো? কখনো উল্টোদিকে খাল বেয়ে গিয়ে পড়ি পদ্মায়। চরের আর পাড়ের মধ্যে পদ্মা সেখানে ঝিমন্ত—তবু সে পদ্মা। স্রোত তার বয়ে চলেছে, ক্ষিপ্র না হলেও গতি আছে স্রোতে। তাতে নৌকা ছেড়ে দিয়ে বাজারের খাল দিয়ে আবার গ্রামে ঢুকব। কুমোর বাড়ির চালা ঘর পিছনে পড়ে থাকে, শীলেদের বাড়ির টিনের চালা দেখা যায় না। পালেদের বড় বড় ঘরওয়ালা বাড়ি এসে গেল—বড় বড় নৌকা বাঁধা ঘাটে। এ তো বাজার। এসে গিয়েছে কিন্তু নৌকাকে খালমুখো করতে পারি না। স্রোতের টানে অ বয়ে যায়। কেবলই বয়ে যায়। প্রাণপণে তিনজনে বৈঠা টানি। হাল জোরে আঁকড়ে মুখ ফিরোয় মূলচরের দাদা, বৈঠা চালাও, চালাও, বুঝি সামলে উঠতে পারলাম। নৌকা খালে ঢুকছে। ভয় কেটে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে সাহসও বেড়ে যায়। আবার, অমন করে পদ্মায় নৌকা ভাসিয়ে হাওয়া খেতেই বা বাধা কি?

পূজার শেষে লক্ষ্মীপূজা—কখনো যেতে হয় কোনো কুটুম্ব বাড়ি—বোন কিম্বা পিসি বা মাসী বাড়ি। অম্বিকা মাঝিকে পেলে আর কথাই নেই। বলিষ্ঠ পুরুষ। তিন প্রহরের পথ সে এক প্রহরে-দেড় প্রহরে নিয়ে যায়। নদী ছেড়ে বহরের খাল বেয়ে চলি। কিম্বা খাল-বিল-ঝোপ-ঝাড়ের মধ্য দিয়ে ভেতরের গ্রামে। জলে ভাসা সব—দ্বীপের মতো এক-একটা পাড়া। গুটিকয় বাড়ি। এদিকে-ওদিকে সব দিকে জল, খাল। মাঝিরা ডেকে ডেকে পথ জিজ্ঞাসা করে—"এ গাঁয়ের খাল কি এটা?" গাঁয়ের ভেতরে

ঢুকলে কখনো সন্দেহ হয়—জল কম হবে কি ওদিকটায়? "দাড়া আছে, মাঝি?" ছোট খালে দুদিক থেকে নৌকা আসছে—দুজনাই হাঁকে—"যার বাঁয়ে।" 'ছাউনি'র বাইরে গলুইতে বসে থাকি। দেখে দেখে শ্রান্ত হই না। কখনো পা ডুবিয়ে দিই জলে, কখনো বা হাত। নৌকা কলকল করে জল কেটে চলেছে। হাতের বা পায়ের দাগও জলের উপর একটা রেখা টেনে একটু কলস্বর তুলে দেয়—অদ্ভুত অনুভূতি সেই জলস্পর্শে। বেতবনের, ঝোপঝাড়ের পাতা ছই-এর কাছে এসে যায়, টেনে ধরি তাই, হাত ছেড়ে চলে যায়। অম্বিকা মাঝি একবার থামে—একটা ছিলিম টেনে নেয়। রৌদ্রে শ্রান্ত হয়ে আমরাও ভেতরে শুয়ে পড়ি। জেগে উঠে দেখি দূরে সোনারং পড়ে রইল। কিম্বা আউটসাহি। কখন পিছনে ফেলে চলেছি অথবা এসে গিয়েছি শ্রীনগরের খালে। নদীর থেকে দূরে খালের দেশ, বিলের দেশ—শ্যামল গাছপালার রাজ্য।

মেয়েরা কোজাগরের নাড়ু পাকাচ্ছেন—লক্ষ্মীর পূজার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। কর্তারা বৈঠকখানায় কেউ গল্প করেন, কেউ পাশা খেলেন। দাদারা কেউ যান দত্তদের বাড়িতে তাস খেলতে। শেষ দিকে যখন গিয়েছি তখন প্রথম মহাযুদ্ধের গল্পে বৈঠকখানা মুখর। একজন জার্মান লেখকের বই-এর ইংরেজি অনুবাদ বাবা তখন পড়ছিলেন—তাতে নীটশে-ট্রিটস্কে-বিসমার্ক থেকে কাইজার পর্যন্ত প্রুসীয় দর্শনের ও দিগ্বিজয়ের তত্ত্ব সগর্বে বর্ণিত। তিনি পড়ছিলেন ও মাঝে মাঝে তা বলেন। কচুরিপানা তখন নতুন এসেছে নদী থেকে খালে; তার নাম দিয়েছে সাধারণ মানুষ 'জার্মান পানা'। সাধারণ মানুষের ধারণা জার্মানরা অসাধ্য সাধন করতে পারে। ইংরেজ অপরাজেয়, এ খ্যাতি আর নেই; এ বিশ্বাসও রয়ে গিয়েছে—বলে না লোক, ছলে ও কৌশলে ইংরেজ সবাইকে হারাবে। 'স্বদেশী'র পরোক্ষ ফল নিঃসন্দেহ। শুধু এই নয়, 'এম্‌ডেন' আন্দামানের বারীন ঘোষদের মুক্ত করে নিয়ে গিয়েছে, খবরটা শুনে এসেছেন নয়া বাড়ির ছোটবাবু শনিবারে লৌহজঙ্গের হাটে। জল্পনা-কল্পনা চলে তারপর। খবরটায় স্থানীয় গুরুত্বও আছে। এ গ্রামের চক্রবর্তীদের দু-ছেলে মানিকতলা বোমার মামলায় ধরা পড়ে। বছর তিন জেল খেটে তাঁরা পূর্বেই মুক্তি পেয়েছেন। তখন কলকাতায় তাঁরা দাশ সাহেবের সহায়তায় কাজে নিযুক্ত। শান্ত, সৎ যুবক। বারীন ঘোষেদের সঙ্গে এ গ্রামেরও তাই একটা সম্পর্ক গ্রামবাসীরা

অনুভব করতে পারেন। সাধারণের মনে ও সম্বন্ধে মোহের অবসান হয় নি— দশ বৎসর পরেও 'স্বদেশীর' স্বপ্নের তখনও অবলম্বন বারীন ঘোষ।

সেবারই বোধ হয় পূজায় গ্রামে ফিরে প্রবাসী যুবকেরা একটা নাটক মহড়া দিয়ে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। দশজনের সাক্ষাৎ পরিচয় আর নারী-পুরুষ সকলের আনন্দলাভের এমন অবলম্বন আর কী হতে পারে? নাটকের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন (স্বর্গীয়) হেমেন্দ্রপ্রসাদ দাশগুপ্ত। আমাদের বাড়িতেও উৎসাহী লোকের অভাব ছিল না। আমাদের পর্যায়ে আমাদের নেতা হলেন যোগেশদা। আমার অপেক্ষা বিশ বৎসরের বড়। তখন তিনি বিহার-ওড়িশ্যার সরকারী ডাক্তার। বুদ্ধিমান, কৌতুকপ্রিয়, কাজেকর্মে চৌকোস। তাঁর উৎসাহ প্রচুর। কিন্তু অভিনয়ে আগ্রহ ও কুশলতা রতীনদার অপরিমেয়। তখন তিনি সম্ভবত বি-এ পড়েন। তাঁরা মহড়ায় যান—গিরিশ ঘোষের 'বলিদান' অভিনয় হবে। 'তেলীর বাগে' চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়দের পৈতৃক ভবনে তার অভিনয় হল। স্কুল বাড়িতে মঞ্চ বেঁধে অভিনয় হতে হতে রাত অনেকটা হয়ে গেল। করুণাময়ের ভূমিকায় হেমেন্দ্রপ্রসাদকে ও দুলালের ভূমিকায় দাদাকে কিছুক্ষণ অভিনয় করতে দেখে ও বয়সে যেভাবে রসগ্রহণ করা স্বাভাবিক তাই করলাম— অর্থাৎ আসরে ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন আবার চেতনা হল তখন নৌকায় বাড়ি ফিরছি—যোগেশদা সমালোচনা করছেন, দাদা কখনো মানছেন, কখনো মানছেন না।

আসলে সেই কটা দিনে গ্রামের মধ্যে নানা দিকেই চাঞ্চল্য দেখা যেত—বিদেশ থেকে সবাই এসেছেন উৎসবের হাওয়া নিয়ে, সচ্ছলতা ও সক্রিয়তা সে হাওয়ায়। কিন্তু এটাও গ্রামের সম্পূর্ণ চিত্র নয়, বারো মাসের রূপ নয়, তাও বুঝতাম। পূজার উৎসবের আনন্দে আশে-পাশে দৈন্যের ছাপ ঢাকা পড়ে না। প্রতিবেশীদেরই কারো কারো চালা জীর্ণ, বাড়ি পড়ো পড়ো—সঙ্গতির অভাব। রোগ-শোকও পায়ে পায়ে। পাড়ারই দু-এক ঘর তো প্রায় নির্বংশ হতে চলেছে। আমাদের ডাক্তারের বাড়ি। পূজোয় যখন কর্তা বাড়ি আসেন বড়ো একটা বাক্স-ভরতি নিয়ে আসেন ঔষধপত্র—এ বাক্স বিশেষ নির্দেশে তৈরি। গ্রমের অনেকে তাঁর জন্য অপেক্ষা করে—পূজার সময়ে সকাল থেকে তাঁরা এসে বৈঠকখানার আঙ্গিনায় দাঁড়াত। দলাদলি রেশারেশিরও শেষ হয় নি। শুনেছি—এককালে ভটচাজদের একজনা

বিয়ে করেছিলেন 'ভরার মেয়ে'। বউ-এর জাত নিয়ে কথা ওঠে, ভটচাজরা কিছুদিন একঘরে হন। আমাদের বাড়ির কর্তারাও তাঁদের পক্ষ নিয়ে লাঞ্ছিত হলেন। বাড়িতে রাত্রিতে ঢিল পড়ত; খোনা নাকে কারা ভয় দেখাত, গ্রামের একজন নাকি একটা অমঙ্গলের স্বপ্নও দেখেছিলেন। কিন্তু সে সবে ফল হয় নি। অপর দলের কর্তা মারা যেতেই সব শান্ত হয়ে গেল। আমাদের কালে দেখেছি—ধোপা-নাপিতে পরস্পরে আদান-প্রদান বন্ধ—ধোপারা নাপিতের কাপড় কাচবে না, নাপিতেরা ধোপাদের কামাবে না। এ বিরোধের জের টেনে ধোপার মুরুব্বি হলেন বৈদ্যরা—ধনে-মানে তাঁদের প্রতিপত্তি। নাপিতের মুরুব্বি হলেন ব্রাহ্মণরা। তেজটা তাঁদেরও কম নয়। ধোপারা করে না ব্রাহ্মণের কাজ, নাপিতরা বৈদ্যের! তাও শুধু নয়—বৈদ্য-ব্রাহ্মণে এদিকের গ্রামে সামাজিক নিমন্ত্রণও বন্ধ। প্রবাসে যে বৈদ্যদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের প্রায় এক পরিবারের মতো আত্মীয়তা, ওঠা-বসা, দেয়া-নেয়া, পান-ভোজন— বাড়ি এলে নৌকা গ্রামের খালে ঢুকতেই তাঁরা বলতেন—'এবার ছাড়াছাড়ি।', ছত্রিশ জাতির গ্রাম,—তারও বেশি। মুসলমানও আছেন পদস্থ—বর্ধিষ্ণু গ্রাম। স্কুল আছে, ডাকঘর আছে, বাজার আছে, শেষ দিকে বৈদ্যদেরই একজনার দানে সুন্দর হাসপাতালও হল। আর তারপরে যখন নতুন করে ব্রতী হলেন গান্ধীজীর প্রেরণায় কংগ্রেস সেবীরা—তখন ধীরেন দাশগুপ্তের বিদ্যাশ্রম সমস্ত বাঙলা দেশেই পল্লীসংগঠনের একটি আদর্শ কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল—আর ঠিক তখনি সেই তন্দ্রানিমীলিত নেত্রী পদ্মা আড় ভেঙে উঠে বসলেন—দু-তিন বৎসরের মধ্যেই লুপ্ত হয়ে গেল বিদগাও-বানাড়ী-খেলিরবাগ।

তবু আমার কাছে রয়ে গিয়েছে সমস্ত স্মৃতিটাই। সেই জলে-ভরা বাড়িঘরের আর্দ্র শ্যামলতা, শরৎকালের স্থলপদ্মের রক্তিমাভা, জ্যোৎস্নায় ফুটে-ওঠা আর ভোরের আলোয় লুটিয়ে-পড়া শিউলি ফুলের শুভ্র সুবাস, দাক্ষিণ্যময়ী শরৎলক্ষ্মীর দু-হাতভরা দান আর পূজার বাড়ির মানুষের সেই স্নেহনরম মুখশ্রী। গ্রামের তা সম্পূর্ণ রূপ নয়, জানি। কিন্তু পূর্ববাঙলার শ্মশানের স্বরূপ কেউ চিত্রিত করে নি। জীর্ণাসন তা হয়ে পড়ে নি। এই উত্তর-পাকিস্তানী পর্বে তা রচনা করতে হলে করতে হবে রঙে-রেখায় ও স্মৃতি থেকে সত্যকে তুলতে হবে মোহমুক্ত কল্পনায়। তাশ-পাশা খেলার সঙ্গে সঙ্গে কর্তারা পূজার নাটমন্দিরে কীর্তন-কথকতার-কবিগানের জের

টেনে ও গুরুপুরোহিতের মুখে শাস্ত্র শুনেও সম্পূর্ণ আর তৃপ্ত নন। রামায়ণ মহাভারত ছাড়া বটতলার উপন্যাসেরও আকর্ষণ তাঁদের মনে রোমাঞ্চের স্পর্শ দেয়—ছেঁড়াপাতার বঙ্কিমচন্দ্রও এসে গিয়েছেন কোনো কোনো ঘরে, ভাঙা আলমারিতে রচিত হয়েছে পাঠাগার। বৈঠকখানায়, বাজারে, ডাকঘরে, কদাচিৎ স্কুলের প্রাঙ্গনে, সপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী', 'হিতবাদী' দশজনে মিলে পাঠ করেন, স্বদেশী হুজুগে বুঝে না-বুঝে কেমন দেশের কথা জানতে হয়। আবার, শহরে পালিত ছেলেমেয়েদের চালচলনে প্রমাদ গণেন। ঢিলেঢালা নিয়মে গ্রামের দুর্বল বেয়াদবদের সাজা দেন; প্রবল দুর্বৃত্তদের নিরুপায়ভাবে সহ্য করে যান। বিবাহ শাস্ত্রাদি উপলক্ষে দলাদলির সুযোগ ছাড়ে না, ঘোঁট পাকান, একে অন্যকে অপদস্থ করেন। আবার আপদে-বিপদে একসময়ে পরস্পরের পাশে এসে দাঁড়ান, আমোদে-আহ্লাদে একত্র হন—কর্মহীন মানুষের তাৎপর্যহীন জীবনযাত্রা উৎসবে-ব্যসনে বয়ে চলে চিরাগত মন্থরতায়। গৃহিণীরা সংসারে রাঁধার পরে খাওয়া ও খাওয়ার পরে রাঁধার ফাঁকে ফাঁকে কড়ি খেলায়, বড়ি দেওয়ায়, মোয়া বাঁধায়, ব্রত-পূজা-পার্বনে প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে মেলেন; আলপনা, পিড়িচিত্রি, কাঁথা-সেলাই, নকসা-আঁকার সহযোগিতায় ও প্রতিযোগিতায় লাগেন। নিন্দায় কুণ্ঠা না থাকলেও গুণের আদরেও কার্পণ্য থাকে না; তারপর বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনীর সঙ্গে রামায়ণ মহাভারতের কথা শুনতে শুনতে, মিলনে-বিরোধে, জন্ম মৃত্যু বিবাহের চক্রেবাঁধা চিরদিনের গৃহধর্ম পালন করে সংসার থেকে বিদায় নেন। নগেন্দ্রনাথের দাসদাসী বহুল জমিদার বাড়ির জীবন এ নয়—'জলসাঘরের' কৃত্রিম ছটা এখানে অজ্ঞাত ও পূর্ববাঙলার ভদ্রসমাজে ঘৃণিত। নিশ্চিন্দিপুরের সর্বজয়ার সংসারের মতো দৈন্যের হীনতাও নেই পূর্ববঙ্গের ভদ্রলোকের জীবনযাত্রায়। পূর্ববঙ্গের এ-চিত্র বাহুল্যহীন কিন্তু সবল, বৈদগ্ধ্যহীন কিন্তু মানবরসে অভিসিঞ্চিত। হয়তো শরৎচন্দ্রের 'নিষ্কৃতি' তার একটা আংশিক চিত্র—কিন্তু 'নিষ্কৃতি' ভদ্রাসনের 'সাগা' নয়, শহুরে পাটেরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

ভদ্রলোকের সেই প্রবাসের পাটের অর্থাৎ বাসাবাড়ির সঙ্গেই আমার পরিচয় বেশি। গ্রামের পাটের সঙ্গে যোগাযোগ নিবিড় হলেও অসম্পূর্ণ। কিশোর মনের সরসতায় তা স্নিগ্ধ, কিন্তু সুপরিচিত নয়।

(ক্রমশ)



রঞ্জন রুদ্র

জর্জ ব্রাক

একটা নীল জায়গা তার ওপর সাদা আকার—ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে এক অজানা পাখি। আরও একটা ছবি দেখলাম—আরও আরও দেখলাম—কেবলই নানান ভাবে পাখিটা এসে জুড়ে বসছে জায়গা। লোকে জিগ্যেস করল, পাখিটা কেন? ব্রাক বললেন, আসতে চাইল। আপনি কি মিষ্টিক? সে আমি জানি না, উত্তর দিলেন ব্রাক। নীল আকাশে—আকাশই তো ঐ নীল জায়গা, নয় কি? ঐ পাখি উড়ে যাচ্ছে—এক মন-জোড়ানো স্বপ্ন-জাগানো শান্তিপূর্ণ বাতাস মুখে এসে লাগল। আরাম দিল—সহজ সুন্দর ছবি। শেষ বয়েসের দিকে কতকগুলো এরকম ছবি তিনি এঁকেছিলেন, যাতে পাখি উড়ে এসে বসছিল।

ব্রাক তাঁর সুদীর্ঘ জীবন ধরেই এই সহজ সৌন্দর্যের সাধনা করে গেলেন—এবং মানুষের জীবনকে অলঙ্কৃত করলেন। ৮১ বছর বয়সে তিনি যখন একটি ছবি অসমাপ্ত রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন, সাধকের এ মৃত্যু কিন্তু আমাদের দুঃখ জাগায় না। তার কারণ, তিনি সারা জীবন ধরে এত দিয়েছেন যে; তাতে এ সভ্য মানবসমাজে সৃষ্টির রত্নরাজি জমাই পড়েছে, সভ্যতা অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে। এঁরা চির নতুন—এঁরা ৮১ বছর বয়সেও যে ছবি

আঁকেন তাতে থাকে একটা বিশেষ করে দেখার মজা, জীবন্ত অভিজ্ঞতার ছাপ। এঁদের কোনও দিনই বার্ধক্য আসে না,—এঁরা মুহূর্তের থেকে মুহূর্তে নতুন নতুন রস আবিষ্কার করেন জীবনে—এবং সেগুলো পরিবেশন করে যেন আবার সবার মাঝে, এঁদের জীবনস্পৃহা, জীবনানন্দ, অনির্বাণ। ব্রাক, তোমাকে নমস্কার জানাই। তোমার মৃত্যুর খবরে হঠাৎ যেন সমস্ত ফাঁকা ফাঁকা ঠেকল, ধরে নিয়েছিলাম যে তুমি চিরকাল থাকবে।

পশ্চিম আমাদের শিল্পজগতকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। করা উচিৎ কি নয় সেটা অন্য তর্কের প্রসঙ্গ, কিন্তু করেছে যে তা অস্বীকার করার পথ নেই। কিন্তু শোচনীয় ভাবে আমরা ঢেউকে বাদ দিয়ে ফেনা পেয়েছি, মূল রসকে বাদ দিয়ে উচ্ছ্বাস পেয়েছি; আমরা ছবি আঁকি বিদেশী ভ্রমণকারীদের মনোরঞ্জনের জন্যে, আমরা আর্ট কলেজ ছেড়ে দেড় বছরের মধ্যে মাতিস, পিকাসো, ব্রাক সকলকে ছাড়িয়ে আধুনিকতর হয়ে যাই—চমক লাগিয়ে প্রসিদ্ধ হবার আকুল আবেগে।

পিকাসোকে আমরা চিনি বেশী—কিন্তু ব্রাক মোটামুটি অপরিচিত বহুলোকের কাছে। তার কারণ বোধহয় যদিও কাগজগুলোতে শিল্প-সমালোচনা হয় আজকাল কিন্তু ব্রাকের সম্বন্ধে লেখা হয়েছে অতি কম। কিন্তু পশ্চিমের শিল্পধারাকে জানতে হলে ব্রাককে জানতেই হবে—কারণ ইউরোপীয় আধুনিক শিল্পরূপের গোড়া পত্তনে ব্রাক একজন অন্যতম ঋত্বিক।

১৮৮২ সালে পারীর কাছে একটি ছোট শহরে ব্রাক জন্মেছিলেন এক রং-করা মিস্ত্রীর বাড়িতে। রঙের নেশা বোধহয় ব্রাকের জন্মের থেকেই রক্তের মধ্যে ছিল কেননা তাঁর ঠাকুরদাদাও ঐ একই বৃত্তির লোক ছিলেন। ব্রাকের বাবা সপ্তাহান্তে অবসর সময়ে চলে যেতেন শহর ছেড়ে দূরে ছবি আঁকতে—ব্রাকের হাতে খড়ি হল সেইখানে—বাবার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও যেতেন ছবি আঁকতে। পড়াশোনায় বিশেষ ঝোঁক না দেখানোতে বাবাও কোনো জোরাজুরি করেন নি ছেলের ওপর—সতেরো বছর যখন বয়স তখন তাঁকে তিনি আপন কাজে সহচর করে নিলেন।

কিন্তু সেই বৃত্তি ব্রাকের জীবনে শুধু অল্প কয়েকদিনেরই হল, কেননা একবছর বাদেই আমরা দেখি তিনি পারীতে চলে এসেছেন—এবং মঁমাতারে একটি ছোট্ট স্বাচ্ছন্দ্যহীন ঘর নিয়ে অজস্র ছবি আঁকছেন। সেই হল শুরু তার শিল্পজীবনের—এবং মাত্র চার বছর বাদেই আমরা দেখি তিনি প্রসিদ্ধ

ও স্বল্পস্থায়ী 'ফোভ' শিল্প-আন্দোলনে জড়িত হয়ে পড়েছেন। মঁমাতারের বোহেমিয়ানদের মধ্যে তিনি অতি প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন সুগায়ক, দক্ষ নাচিয়ে ও অ্যাকরডিয়ন বাজিয়ে হিসেবে। তার ওপর সুপটু মুষ্টিযোদ্ধাও ছিলেন তিনি। 'ফোভ' আন্দোলন বর্তমান ইউরোপীয় শিল্পধারার ওপর বেশ একটা ছাপ রেখে গিয়েছে—নামটির যদিও মানে 'বন্য জন্তু'। সেটা ব্রাক বা তাঁর বন্ধুদের নির্বাচিত নয়—তৎকালীন এক শিল্প সমালোচকের বিদ্রূপ থেকে তৈরি। মাতিস ছিলেন ঐ গোষ্ঠীর কুলগুরু। তাঁরা ছবি আঁকতেন প্রায় অমিশ্রিত রঙ সঙ্গে পাশাপাশি বসিয়ে। দশটা সেই ধরনের ছবি যদি রাখা হয় একটি ঘরে রঙের ঝড়ে ভূমিকম্প হয়ে যাবে সেখানে।

কিন্তু ব্রাক সরে পড়লেন ধীরে ধীরে এই গোষ্ঠীর থেকে—কারণ এই বিস্ফোরণধর্মিতা 'ফোভ' শিল্পীদের ছবি থেকে রেখা ও আকার প্রায় উড়িয়ে দিচ্ছিল—এবং আবেগপ্রবণতা ব্রাক চরিত্রের স্বধর্ম নয়। তাই তাঁর 'ফোভ' ছবিগুলোতেও আমরা দেখি একটা লুকোনো বাঁধন। ১৯০৮ সালে সেজানের (Cezanne) ছবি দেখে যে তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হলেন তাতে আমরা বিস্মিত হই না—কারণ সেজানের সূক্ষ্ম বিচারবিশ্লেষণমূলক ছবিগুলো ব্রাকের আপন ধীর প্রকৃতির সঙ্গে মিলল। তিনি 'ফোভ' ছেড়ে দিয়ে যে ছবিগুলো আঁকতে শুরু করলেন—সেটা হল যুগান্তরকারী—তার নামকরণ হল কিউবিজম। ঐ একই সময়ে পিকাসোও একই ভাবে চিন্তা করছিলেন—এবং এক বিচিত্র অথচ অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব গড়ে উঠল দুজনের মধ্যে। ছয় বছর ধরে এই দুইজন একসঙ্গে ছবি আঁকলেন ও চিন্তা করলেন—এবং এই দুই যুবকের মিলিত চিন্তা শিল্পজগতে আনল কিউবিজম্-এর বিপ্লব। সংযত, সমুন্নত, ধীর ও বিশ্লেষণকারী ব্রাকের সঙ্গে আগ্নেয়গিরি পিকাসোর যে মিল হবে এইটাই আশ্চর্য মনে হয়।

১৯১৪ সালে ইউরোপের মহাকাশ কালো করে এল মহাযুদ্ধ। ব্রাককে যেতে হল যুদ্ধক্ষেত্রে। তিনি প্রচুর বীরত্ব ও সাহস দেখালেন, কিন্তু শেষে ১৯১৫ সালে বিষম আহত হন, বহু মাস ধরে তাকে শয্যাশায়ী থাকতে হয়।

যুদ্ধ শেষ হলে ব্রাক ছবি আঁকতে আরম্ভ করলেন, কিন্তু তিনি দেখলেন, তিনি আর পিকাসোর সঙ্গে এক পথে চলতে পারছেন না। বন্ধুত্ব বিচ্ছেদ হল না, কিন্তু পথ ভাগ হল। ব্রাক যাত্রা শুরু করলেন একাকী আবিষ্কারের।

কিউবিজম শক্ত শক্ত কাটা কাটা কোণা কোণা রেখা ও আকার ধীরে

ধীরে বেরিয়ে যেতে লাগল তার ক্যানভাস থেকে—তার বদলে এল নতুন ছন্দ—মৃদু—উগ্রতা নেই, তীব্রতা নেই, ধাঁধা নেই—আছে কোমলতা, আছে শান্তি, আছে সমন্বয়ের সঙ্গীত, আছে সহজ সুন্দরতা। ব্রাকের ছবি কাউকে আর চেঁচিয়ে ডাকত না—একটু পাশে সরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পছন্দ করত। কিন্তু যদি পথিক তোমার তাড়া না থাকে, যদি আরেকবার দেখার কৌতূহল জাগ্রত হয়ে থাকে, তবে শুনতে পাবে মৃদুস্বরে কি যেন বলছে সেই ছবি—কে যেন তোমার গায়ে মুখে সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিল—কে যেন ডেকে নিয়ে গেল এই ব্যস্ত উগ্র চঞ্চল কোলাহলপূর্ণ জগৎ থেকে অন্য এক জগতে। হঠাৎ দেখলে একটা কালো, পিঙ্গল আর বাদামী—তিনে মিলে ধরেছে তান,—এক অপরূপ আমেজ। ছবিটা কিসের? ভালো করে দেখ, ও। দুটো মাছ! এ তো অতি সাধারণ জিনিস—পরী নয়, স্বর্গোদ্যান নয়, ফোয়ারা নয়, শুধু দুটো মাছ একটা প্লেটে একটা টেবিলের ওপর। কিন্তু এ কি জাদু? এ কি সৌন্দর্য? এ কি নবদৃষ্টি—কই, এর আগে তো মনে হয় নি দুটো মাছ একটা প্লেটে একটা টেবিলের ওপর এত সুন্দর দেখতে হয়? শুধু মাছ নয়—ফলমূল গেলাস বাটি হাতা চামচ খবরের কাগজ—এই নিয়ে ছবি এঁকে চললেন। আরও আঁকলেন—নগ্নদেহী নারী, সমুদ্রের বুকে নৌকো, মাঠ গাছপালা। এঁকেই চললেন। ৮১ বছর হয়ে গেল। আঁকতে আঁকতেই একদিন তিনি ব্রাশটি রেখে বিশ্রাম নিলেন। একটি ফোয়ারা বন্ধ হয়ে গেল। একটি বাঁশী আর বাজল না। কিন্তু মৃত্যুর আগে ব্রাক তুমি যদি ফিরে তাকিয়ে থাক, তবে এই স্বস্তি নিশ্চয়ই পেয়েছ দেখে যে তোমার ৬৩ বছরের অফুরন্ত কাজ মানুষের সৌন্দর্যবোধকে একটা উচ্চতর পর্যায়ে পৌছে দিয়েছে।

১৯৩০-এ পিকাসো আর মাতিসের কাছাকাছি ব্রাক আরেকবার এসেছিলেন তাঁর ছবিতে। পর পর পাঁচ বছর তিনি যে ছবি আঁকেন প্রায় সকলেরই মনে হয় যে সেগুলোই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ, যেন তাঁর জমা সব অভিজ্ঞতা সব সঞ্চয় তিনি ঢেলে দিয়েছিলেন তাঁর এই ছবিগুলোতে—সেই পাঁচ বছরকে অনেকে বলেন ব্রাকের জীবনের 'স্বর্ণ সময়'।

পৃথিবীতে এত ভয়, এত দ্বন্দ্ব, সংবাদপত্রগুলো তো তাই নিয়েই থাকবে। ভারতবর্ষ? দারিদ্র্যের ছবি যেন হিটলারের কন্সেনট্রেশন ক্যাম্প। এত দুঃখ, এত অনটন, এত সমস্যার মাঝে থেকে কোথায় দূরদেশে কোন এক শিল্পী

ছবি এঁকে গেলেন, তারপর মরে গেলেন, সেটার খবর কি রাখবার আমাদের সময় আছে? অন্ধকার যখন সামনে ও চারিদিকে, নিরাশায় ভেঙে পড়া অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু যখন দেখি সবকিছু সত্ত্বেও ফোয়ারার মতো, উদ্ভিদের মতো, প্রাণশক্তি উর্ধ্বগামী তখন আশা আসে। শিল্পীর সৌন্দর্যসাধনা এই প্রাণশক্তির পরিচয় এবং ব্রাকের মতন একজন শিল্পী যে করেছিলেন তাতেই আমরা জীবনের জয়ের নিশানা দেখি। যতদিন মানুষ সৃষ্টির পথিক ততদিনই তার আশা।

শুধু ছবির নানান সমস্যা নিয়েই ব্রাক সারাজীবন ব্যস্ত ছিলেন না। সামাজিক সমস্যাও তাঁর ছবিতে বর্ণিত হবার সুযোগ পায় নি। তিনি কেবল সৌন্দর্য পরিবেশন করে গিয়েছেন। মাতিস একবার বলেছিলেন: আমাকে একদলা কাদা দাও, আমি সেটা সোনা করে তোমাকে ফেরত দেব। ব্রাকও আমাদের সেই দেখালেন। দুটো মূলো, একটা ভাঙা লণ্ঠন বা একজোড়া মাছের মধ্যে যে কত আলো, ছন্দ, রূপ, কথা লুকোনো ছিল সেটা তিনি দেখালেন। মাতিস আরেকবার বলেছিলেন: আমার ছবি আরাম কেদারায় হেলিয়ে পড়ার আনন্দের মতো সুখ তোমাকে দেবে। তাই আমি চাই আর কিছু নয়। ব্রাক কথায় সেরকম কিছু বলেছেন কিনা জানি না, তবে তাঁর ছবির সঙ্গে যে নিরিবিলি ঘর করতে ইচ্ছে হয়, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

ব্রাকের দুটো উক্তি তুলে দিয়ে আমার এই আলোচনাটুকু শেষ করব। এক "A picture is an adventure each time. When I tackle the white canvas, I never know how it will come out. This is the risk you must take. I never visualize a picture in my mind before starting to paint." অন্যটি, "When a picture leaves my house, it is for always. When I see one in a collection, I sometimes even have the impression it is not by me."

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

গোলাপ হয়ে উঠবে

(পূর্বানুবৃত্তি)

মামার বাড়িতেই নন্দিনী মানুষ হয়েছিল। মামাদের নিজেরই ছয় মেয়ে। ছয় মেয়ে নিয়ে বিব্রত মামার সংসারে নন্দিনী কোনোদিন আলাদা অযত্ন কিছু পায় নি। সকলেই যেখানে হেলায় ঘেন্নায় অভাবে অনটনে মানুষ হয় সেখানে আর আলাদা অযত্ন করার কী আছে। তা ছাড়া মামারা ঠিক সেরকম অবিবেচক ছিলেন না। দাদামশাইয়ের শিক্ষা রক্তে কিছু ছিলই। তবে অনেক শান্ত হয়ে গিয়েছিল সে রক্ত। যাই হোক আলাদা করে অযত্ন কিছু না হলেও একটা জায়গায় একটু তফাৎ হয়ে গেল। বয়সের হিসেবে নন্দিনী ছিল মামার বড় দুই মেয়ের পরেই। বড় দুজনার বিয়ে হয়ে যাবার পরে নন্দিনী দেখল মামা-মামিমা তাঁদের তৃতীয় ক্রমে চতুর্থ, পঞ্চমের জন্য ভাবছেন। নন্দিনীর জন্য ভাবছেন না। নন্দিনী লেখাপড়া শিখুক, নিজের পায়ে দাঁড়াক—এই পরামর্শই নন্দিনীকে সবাই দিয়েছে। মাঝে মাঝে দিদিরা শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরলে নন্দিনীকে জড়িয়ে ধরে আদর করত—এখনো কী সুন্দর আছিস তুই। বেশ আছিস ঝাড়া হাত-পা। এই ছাখ না আবার হবে, কলেজে ম্যালথাস পড়ালে কী হবে, তোর জামাইবাবু—নন্দিনী শুনত, প্রথম প্রথম শিউরে উঠত, পরে সয়ে গেলে, অপমানিত হত। বি. এ. পাশ করে নন্দিনী যখন এই চাকরিটা জুটিয়ে নিল তখন সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। মামা-মামিমা খুশি হলেন। মামিমার পরামর্শে আন্তরিকতা ছিল। তিনি বললেন নন্দী, টাকা খরচ করে ফেলিস নে, জমাতে শেখ, টাকা জমিয়ে বিয়ে কর। মামা বললেন—কোনোদিন তো কিছু ভালোমন্দ খাওয়াতে পরাতে পারি নি মা, তুই সুখে থাক তোর টাকা নিয়ে।

নন্দিনী বলল—আমি দুই-ই করার চেষ্টা করতে লাগলাম। একটু একটু নিজের শখ সৌখীনতা মেটাতে লাগলাম, আর দুটো-পাঁচটা টাকাও জমিয়ে

গেলাম। চাকুরী-জীবন, বলতে কী, আমার ভালো লাগে নি। একদিনের হয়ও না। এমন সময়ে আমাদের অফিসে একদিন প্রিয়ব্রতর সঙ্গে দেখা হল। ওর নামটা বলেই একটু বিব্রত হল নন্দিনী। থেমে থেমে তারপর বলে কলেজে—ওর সঙ্গেই আমি পড়তাম। কলেজে আলাপ ছিল মাত্র। আমাদের ক্লাশের অন্য ছেলে মেয়ের তুলনায় আমরা একটু অন্য ধরনের ছিলাম। আমার সকালবেলায় মাস্টারি। ওর সকাল সন্ধ্যেয় ট্যুইশনি। দেখা হলে দুটো একটা কথা হত মাত্র। আর সে দেখাটাও হত প্রিন্সিপ্যালের ঘরের সামনে ফাইন মকুব করানোর পিটিশন হাতে। কখনো যে মাসের মাইনে সে মাসে দিতে পেরেছি বলে মনে হয় না। এই অফিসে ও আসত কনট্র্যাক্ট ধরতে। ও সরকারি অফিসে কাজ জোটালেও অবসর সময়ে ছোট, মাঝারি ঠিকে ধরার চেষ্টা করত। এক আধবার দেখা হয়েছে; হেসে বসে খানিকক্ষণ কথা হয়েছে। একদিন টিফিন আওয়ারের পরে দেখি লিফটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। খুব ক্লান্ত, উদভ্রান্ত দেখাচ্ছিল ওকে। ও কিন্তু একেবারেই সাধারণের মতো নয়। অনেকদিন দেখেছি বাজে ব্যাপারে ও কখনো আটকে থাকে না। ও সব সময় যেন দূরের দিকে তাকিয়ে আছে। ক্লাশেও দেখতাম, অফিসেও দেখেছি সবাই যে ধরনের ব্যাপার নিয়ে গল্প করে বা অহঙ্কার করে ও সে সব নিয়ে কখনো মাথা ঘামাতো না। ওভাবে ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, এগিয়ে গিয়ে যখন শুনলাম ও আমারই জন্যে অপেক্ষা করছে তখন একটু অবাক হয়ে গেলাম। বলল বিকেলে দেখা করতে। আমি বললাম না কিছু। ভাবলাম এও বোধ হয় সিনেমা দেখানোর কথা বলবে, কিম্বা কোথাও খাওয়ার কথা। জানেন, আমি অনেক দেখেছি। দেখে দেখে আমার মুখস্থ হয়ে গেছে সব। প্রথম দৃশ্যটা দেখেই শেষ দৃশ্যটা ভেবে নিতে পারি। তাই ও যখন এরকম দেখা করতে বলল একটু দুঃখ পেলাম। ছুটির পরে দেখা করলাম ওর সঙ্গে। শুকনো মুখে ডালহৌসির ব্যস্ত সমস্ত সবাই তখন বাড়ি ছুটছে। ভারি ভালো লাগল ও আমাকে সিনেমাতে নিয়ে যেতে চাইল না দেখে। এমন কি কিছু খাওয়াতেও চাইল না। একটা বাস স্টপের কাছে দাঁড়িয়ে ওর কথা ও আমাকে বলল। একটা টেণ্ডার দিয়েছিল ও আমাদের অফিসে। আমাদের সেকশনের মিঃ কাকারিয়া এর কর্তা। কেঁচে যাবার সম্ভাবনাই বেশি। কেননা কাকারিয়া সাধারণত ন্যায় পথে চলে। বে-আইনি কাজ করার কোনো মানে না থাকলে সে করে না। প্রিয়ব্রত জিজ্ঞাসা করল আমি

আমার ইনফ্লুয়েন্স খানিকটা খাটাতে পারি কি না। অনেক টাকার কাজ। ও প্রায় খোসামোদ করল। বলল না হলে ডুবে যাবে ও। আমার কেমন মায়া হল। আর আবার মনে হল ও অন্যদের মতো নয়। ওকে আর কিছু বললাম না, শুধু বললাম, দেখি। নন্দিনী চুপ করে খানিকক্ষণ তাকাতে লাগল। বোধ হয় সে ভাবছিল বাসের পর বাস চলে যাচ্ছে। ফিরে যাবে, মানসিক তোলপাড়ে ক্লান্ত সেই সন্ধ্যেটার কথা।—হাঁটতে হাঁটতে থামতে থামতে কখন রাজভবনকে পাশে রেখে ওরা ময়দানের মাঝখানে পৌঁছে গিয়েছিল। দূরে কল্লোলিত ট্র্যাফিক—চৌরঙ্গীর সান্ধ্য লোভানি। আর ময়দানের হাওয়ায় হাওয়ায় স্বপ্ন দেখার যোগাড়।

—ওর খুব খিদে পেয়েছিল। ফুচকা খেতে খেতে ও আমাকে সব সুলুক সন্ধান বলে দিল। কাকারিয়া কোথায় থাকে, কী ভাবে তাকে ধরতে হবে। মুস্কিল হয়েছে লোকটা টাকা নেয় না। সব শুনলাম চুপ করে। সত্যি বলছি আপনাকে, ভীষণ মায়া লাগছিল। ও যে অন্যদের মতো নয়, অন্য কোনো মতলব নিয়ে আমার কাছে আসে নি এটা মনে করে খুব ভালোও লাগছিল। চেষ্টা-চরিত্র করে কাকারিয়াকে ধরলাম। সেদিন কাকারিয়া খুব ভালো ব্যবহার করল। হেসে জিজ্ঞাসা করল পার্টি তোমার কে হয়?—চুপ করে রইলাম। কাজটা করে দিল। দিয়ে বলল—মিস তুমি এটা অন্যায় সুযোগ নিলে কিন্তু। এদিকে ও খুব খুশি হল। কিন্তু আমি খুব খুশি হলাম এই দেখে যে ও আমাকে এভাবে ওভাবে সেভাবে খুশি করার চেষ্টা করল না। মাস চারেক বাদে আবার দরকার পড়ল। আবার কাকারিয়ার সঙ্গে একা দেখা করলাম। কাকারিয়া করে দিল কাজটা। হাসল, আর আবারও বলল যে তুমি ভয়ানক আনডিউ এ্যাডভ্যান্টেজ নাও। আমি একে কিছু বলতাম না। কেননা ও কখনো জিজ্ঞাসা করত না কাকারিয়া কী বলল, কী কথা হল, কী করে করলাম। তৃতীয়বারে—

মুখখানা শাদা হয়ে গেছে নন্দিনীর। সে বোবা পাথর হয়ে গেল যেন। সুব্রত বলল, তুমি তৃতীয়বারেও অন্তত প্রিয়ব্রতকে বললে না কেন সব?

—সেদিন বলব বলে ঠিক করেছিলাম। কিন্তু সেদিনই ও আমার সঙ্গে বিয়ের কথা পাড়ল। আমি ভয়ে লোভে মাথা ঠিক রাখতে পারল না। সবই লুকিয়ে গেলাম, তৃতীয় বারে কাকারিয়াও যে কিছু অন্যায় সুযোগ নিয়েছে

কথা ভাঙলাম না। ভাবলাম বিয়ে হয়ে যাক, তখন ঠিক হয়ে যাবে সব। …অন্যায় সুযোগ নিলাম।

—বিয়ের পরে বললে না কেন?

ঘরের আলোকে পিছন করে, মুখে একরাশ অন্ধকার মেখে নন্দিনী বলল—কতবার বলতে গেছি, কথাটা তুলতে গেছি, ও এড়িয়ে গেছে। আরো একবার যেতে হয়েছে কাকারিয়ার কাছে। আমার ভালো লাগছে না, ওকে যদি বলি, যদি বলি চাকরি ছেড়ে দেব ও মাথায় হাত দিয়ে বসে। ও কিসের পেছনে ছুটছে কে জানে! এ কারণেই আমি কলকাতায় যেতে চাইছি না। ও কি জানে না কাকারিয়ার কাছে কেন আমি এত প্রশ্রয় পাই—জানে। ভালো করেই জানে। সেটাকে কখনো সে মুখোমুখি স্বীকার করে না, এই যা। কিন্তু আমি পারছি না আর। একবার যা হয়ে গেছে সেটা পাপ বলে অনুশোচনা করতে পারি সারাজীবন। কিন্তু সেটাকে জীবনের একটা অঙ্গ করে নিতে পারি না। প্রিয়ব্রত জানে না, ও শুনতে চায় না যে আমার মা উনিশশো আটাশ সালে সারা গ্রামে বিয়ের উপযুক্ত পাত্র দেখতে পায় নি, বলেছিল, ভালো ছেলেরা সব তো জেলখানায়। আমার মা আর আমি এত দূর হয়ে গেলাম কী করে। বলতে বলতে নন্দিনী আলোর দিকে মুখ ফেরাল। উত্তেজনায় লাল। চকচকে চোখ। জানেন আমার মা···কথা হারিয়ে গেল হঠাৎ যেন হতাশা নেমে এল।

সুব্রত বলল—উনিশশো আটাশ আর উনিশশো পঞ্চাশে অনেক তফাত নন্দিনী।

—কেন জানি না সব যেন কেমন কেমন হয়ে যাচ্ছে।

—তুমি আমাকে কী করতে বলছ? প্রিয়ব্রতকে কিছু বলতে বলছ কি?

—না, না, সেটা ঠিক হবে না। আমি শুধু আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি আমাকে কী করতে বলেন?

—প্রিয়ব্রতকেই সব খুলে বল। সুব্রত নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। কোথাও যেন কোনো সিদ্ধান্ত নেই। কেন নন্দিনী স্পষ্ট একটা কর্তব্য স্থির করতে পারে না। সিঁড়ির নিচে ওর ঘরের রোয়াকে বসে থাকল সুব্রত। প্রিয়ব্রত বাড়ি ফিরল শেষ ট্রেনে। নিষ্ঠুরভাবে সিগারেটটাকে ঠোঁটের কোণে কামড়ে ধরে প্রিয়ব্রত সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। সুব্রতর সঙ্গে কথা বলার জন্য তার বিন্দুমাত্র ব্যস্ততা আছে বলে মনে হল না। সিঁড়ির মুখে

দাঁড়িয়ে ছিল নন্দিনী। চুল না-বাঁধা এলোমেলো শাড়ি পরা শিথিল নন্দিনীকে দেখে প্রিয়ব্রত থমকে গেল।

—তুমি আজ অফিসে যাও নি?

—না।

—না মানে, তুমি তাহলে ওর সঙ্গে দেখা কর নি?

—না।

—নন্দিন—রক্তকরবীর রাজার মতো নন্দিনীকে আদর করে নন্দিন বলত প্রিয়ব্রত।

—তুমি পাগলামো করছ।

নন্দিনীর হাত ধরে প্রিয়ব্রত ওকে ঘরে নিয়ে গেল। খাটের একপাশে বসিয়ে দিয়ে পাখাটা পুরোদমে চালিয়ে দিল। নন্দিনী ঘাম-ভেজা মুখখানা নিচু করে বসে রইল। চিবুকের নিচেয় হাত দিয়ে ওর মুখখানাকে নিজের মুখের দিকে তুলে নিয়ে প্রিয়ব্রত বলল—তুমি লক্ষ্মী মেয়ে হবে না?

রুদ্ধ কণ্ঠে নন্দিনী বলল—আমি চাকরি ছেড়ে দিতে চাই।

আচমকা চিবুকটা ছেড়ে দিয়ে প্রিয়বত বলল—সে হয় না। ধাক্কা দিয়ে প্রিয়ব্রতকে সরিয়ে দিয়ে নন্দিনী ঘর থেকে উঠে গেল। নন্দিনীর পিছন পিছন আঁচলটা মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছিল। প্রিয়ব্রত জুতো দিয়ে সেটা চেপে ধরতে পারত। কিন্তু কী ভেবে চুপ করে দাঁড়িয়েই থাকল। নিঃশব্দে বাতাস কেটে কেটে পাখাটা ঘুরতে লাগল। প্রিয়ব্রত সিগারেটটা ছাইদানিতে গুঁজে দিয়ে আবার পাখার তলাতেই এসে দাঁড়াল। কলতলা থেকে চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে নন্দিনী ফিরে এল ঘরে। প্রিয়ব্রত গেঞ্জি আর পাজামা পরে ইজি-চেয়ারে গা এলিয়ে দিল।

—তুমি কলকাতা যাবে না। নন্দিনী স্থির কণ্ঠে বলল।

—বেশ না গেলাম, তার সঙ্গে কাকারিয়ার সঙ্গে কথা না বলার কী আছে।

—কলকাতা না গেলে এতেই আমাদের বেশ চলে যাবে। বেশিতে আমাদের দরকার নেই।

—আমাদের বলতে তুমি কী বলছ?

—আমাদের সকলের কথা বলছি। আমার তোমার, দাদার, মায়ের।

—ন্যাকামি রাখ। আমি শুধু আমার কথাই ভাবছি, ভাবব। আর কিচ্ছু নয়।

—মা?

—মা দাদার কাছে থাকবে। দাদাকে সংসারের ভার কিছু নিতে হবে না? ... এ শার্কার। চিরদিন দেখে আসছি, শার্কার। আমি আর এসব বরদাস্ত করব না।

—যাই হোক কাকারিয়ার কাছে আমি আর যাব না।

—কী করবে সে তোমার? খেয়ে ফেলবে?

—কিচ্ছু যদি সে নাও করে তাহলেও না, কোনো অন্যায়ের মধ্যে আমি নেই।

—এ সমস্ত বড় বড় কথার বদভ্যাস তো তোমার ছিল না নন্দিন।

—তুমি জানো না আমার মা···

—একশো তেরো বার হল এই নিয়ে। কিন্তু ভুলে যাও কেন সেটা উনিশশো আটাশ সাল, এটা উনিশশো পঞ্চাশ। তুমি যদি জানতে কিছু, বুঝতে আটাশ সালের মডেল লোকেরা আটাশ সালেই ফেলে দিয়েছে।

বাইরে থেকে হু হু করে একরাশ হাওয়া ঢুকল ঘরে। ফ্যানের হাওয়ার সঙ্গে সংঘর্ষে মৃদু গর্জন উঠল ঘরে। শিথিল ক্লান্ত নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বোধ হয় মায়া হল প্রিয়ব্রতর। এগিয়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করল ও। আলোটা নিবিয়ে দিয়ে দুহাতে নন্দিনীকে তুলে বিছানায় নিয়ে গেল প্রিয়ব্রত। নন্দিনীর ইচ্ছে করছিল তুমুল বাধা দেয়। কিন্তু প্রিয়ব্রত তাকে সম্পূর্ণ শিথিল করে বিচিত্রভাবে আদর করতে লাগল। নন্দিনী বাধা দিল না। শতকরা সত্তর ভাগ আদরের সঙ্গে তিরিশ ভাগ অনুযোগ মিশিয়ে প্রিয়ব্রত নন্দিনীকে ওর নিজের কথা বোঝাতে লাগল।

সুব্রত নিজের ঘর থেকে বুঝতে পারল ওরা ঘুমুতে গেছে। উঠোনের চৌকো আলোর দাগ মুছে গেল। নন্দিনী নিজে যা করবার করুক। সুব্রত কী করে প্রিয়ব্রতকে বলবে কোনো কথা। অনেকদিন আগে সুব্রত একবার প্রিয়ব্রতকে একটা কোন্ বিষয়ে পরামর্শ দিতে গিয়েছিল। প্রিয়ব্রত শোনে নি। উল্টে সুব্রতকে বলেছিল সংসারের একটা ব্যাপারেও সুব্রতর বলার কিছু থাকা উচিত নয়। মিন্‌স্ অফ প্রোডাকশনটা এ সংসারের যখন আমার হাতে তখন ক্ষমতাটাও আমিই প্রয়োগ করি। এই কথা বলে পাড়ার কমলাক্ষদার উদাহরণ দিয়েছিল প্রিয়ব্রত। কমলাক্ষদা সকালে ট্যুইশনি করে। নটা-চল্লিশের গাড়ি ধরে। অফিস আওয়ারেই ফাঁকে ফাঁকে

লাইফ ইনসিওরের শীকার ধরে। বিকেলে এখানকার অর্ডার সাপ্লাইয়ের জন্য সওদা করে। রাত্রি সাড়ে নটায় যখন ফেরে দু কাঁধে ব্যাগ। হাতে বোঝা। কুলিকে সামলাতে সামলাতে সোজা হয়ে রাস্তা চলছে—তখন তাকে গ্রিয়েলি একটা হিরো বলে মনে হয়। বোনের মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। ভাইপোকে মেডিকেলে পড়ায়। সমস্ত বাড়ির লোকেরা রাত সাড়ে নটায় দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। ছোটগুলো পর্যন্ত তাকে না দেখে ঘুমোতে যায় না। একটা পুরোদস্তুর মানুষ। দারুণ ভীড়েও শেষ শান্তিপুরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আসবে—কোনো কমপ্লেন নেই। আর তোমরা—তোমরা শার্কার?

ল্যাস্কির বইখানা টেনে নিল সুব্রত। পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি। লিবারেল রাজনীতি। কোথায়? হিঁদু মুসলমান। নায়ার পারিয়া, ছুঁইহার ছত্রি—সার্বজনীন ভোটাধিকারের সুযোগ। কী হবে রাইট্ টু ক্রিটিসিজম্-এ। রাইট টু চেঞ্জ—শাসকশ্রেণী তাহলেই কি শমন দেখবেন না। রাইট টু চেঞ্জ ছাড়া রাইট টু ক্রিটিসিজম-এর মানে কী? দেখতে দেখতে ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল সুব্রতর।

একা এ বাড়িতে জেগে রইলেন সুব্রতর মা। হাঁপানির টান ঘুম আসে না। মনে আসে যত পুরনো কথা। কখনো সুব্রতর কথা, কখনো প্রিয়ব্রতর কথা। কখনো ওদের বাবার কথা। যে লোকটা ভালো করে বাঁচতে জানতেন। কিন্তু হিসেব করে বাঁচতে জানতেন না। শেষ রাতে হাঁপানির টান বাড়বে। কাসির বেগ বাড়বে। তারই ফাঁকে ফাঁকে তিনি চেষ্টা করবেন ইষ্টনাম জপ করতে। যন্ত্রণা তাকে ভালো করে তা করতে দেবে না। কিন্তু তিনি ছাড়বেন না।

সেই গঙ্গার ঘাটের শেষ পৈঁঠের ওপরে রুচি বসে ছিল।

শান্তনু আর সুব্রত যখন গিয়ে পৌছল তখন বিকেল। জলের কাছে পা রেখে রুচি বসেছিল চুপ করে। পিঠের ওপর বিনুনীটা বেঁকে রয়েছে। ঘাড়ের উদ্ধত ভঙ্গিতে কমনীয়তা। লালে কালোয় মেশা সরু পাড়ের শাড়ির আঁচলটা সরু কোমরে জড়ানো। শেষ রোদে দু হাতের বালা দুটো চিক চিক করছে। শান্তনু চেঁচিয়ে ডাকল—রুচি। ঘাড় ফিরিয়ে রুচি হাসল। রুচি হাসতে সুব্রতরও খুব ভালো লাগল। এক সঙ্গে দু-তিনটে সিঁড়ি ডিঙিয়ে ও

নেমে গেল। শান্তনু আস্তে আস্তে সবকটা সিঁড়ি পেরিয়ে নামল। রুচি শান্তনুর দিকে ভালো করে তাকিয়ে হাসিটা নিবিয়ে ফেলল—

—কী হয়েছে তোমার বলো তো। বাবা বলেন স্কুলেও না কি খুব অন্যমনস্ক থাক;

—প্রেমে পড়িনি। সুতরাং দিদিমণি ভয় নেই।

—হ্যাঁ দেখো দেবদাস হয়ো না যেন।

—পার্বতী জুটলে তবে তো দেবদাস। আমরা বড় জোর হতাশ হালদার, সিগারেট খেয়ে বুকে ব্যথা। এর বেশি কিছু হবে না। না হাসলেও কিছু হত না এমন একটু হাসল শান্তনু।

দক্ষিণে গঙ্গার বাঁক। উত্তরে জুবিলি ব্রিজ। রুচি যেন সুব্রতর সঙ্গে কথা বলার সাহস পাচ্ছে না। তাই দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল ইতস্তত। আর সূর্য থেকে রঙ ছেঁকে নিয়ে রুচি যেন একটু অবাস্তব হয়ে গেল। ঠিক সেই সময় রুচিকে ভয়ানক হৃদয়হীন বলে মনে হল সুব্রতর। ভালো করে ও শান্তনুকে জিজ্ঞাসা করতে পারল না কেন কী হয়েছে তোমার? নদীর জল কুল কুল করে সেদিনের মতো কথা কইছে।

সুব্রত জিজ্ঞাসা করল—ডেকেছিলে?

সহজ হয়ে রুচি বলল—দুটো ছেলে এসেছিল।

—কী বলে তারা?

—রমেনদার শোক সভা করবে। আমাকে সভায় থাকতে বলছে, বলছে কিছু বলতে হবে।

—কারা এরা?

—কি জানি। বলছে পার্টির নেতারা আজ লাইন বদলে তাকে ভুলে যেতে পারে, কিন্তু লড়াকু জনতা ভুলবে না।

—ভাষা শুনে তো মনে হচ্ছে বাইরের ছেলে নয়। তারপর?

—তারপরেই মানবদার চিঠি নিয়ে একজন এল। চিঠিতে লেখা—এ জাতীয় কোনো মিটিঙে যেন যোগ না দিই।

—আচ্ছা আমি খোঁজ নিচ্ছি।

শান্তনু চুপ করে বসেছিল। অন্যমনস্ক। পশ্চিমের মেঘ যেন বিরাট বিস্ফোরণের অবশেষ। কাল রাত্রে হিরোশিমার উপরে লেখা একখানি বই পড়ছিল। মনে পড়ল। পরমাণুকে বিদীর্ণ করে মানুষ আলো জালাল না—

আরো আঁধার ডেকে এনেছে। মানুষই নিয়ামক সব কিছুর। সে যদি আদি বিশ্বাস, আদিম যন্ত্রপাতি নিয়ে চলেছে তাহলেও তার বিচার হয়েছে তার অন্তরের মাপকাঠিতে। আর আধুনিকতম সভ্যতার বাণী যখন সে উচ্চারণ করে, আধুনিকতম বিজ্ঞানের জয়কীর্তির উপরে দাঁড়িয়ে তখনও তার বিচার হবে তার অন্তরেরই আলোকে। শান্তনু বলল—

—যদি কেউ রমেনের জন্য শহিদ-স্মরণ সভা করতে চায় করুক না। রমেন যে মরেছে এবং তার মরার ভেতরে যে আন্তরিকতা ছিল এ কথায় তো সন্দেহ করার কিছু নেই।

—হায় শান্তনু—একটা কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুব্রত—অত সহজেই যদি সব কিছুর মীমাংসা হত।

—একটা এক্সটেণ্ডেড জি. বি. মিটিং ডাকছে ওরা, কথাটা জিজ্ঞাসা কোরো তো।

—যদি আমায় ডাকে, তবেই।

শান্তনু জলের দিকে তাকিয়ে বলল, কোনো বড়সড় জমায়েতে যেতে ভয় করে। কতজনকে যে দেখব না কে জানে। কতজন নেই, কতজন থেকেও আসবে না। মনীশ নাইনথ মার্চের পরের দিন সকালেই চাকরি থেকে সাসপেণ্ডেড হয়েছে। বৌ ছেলেমেয়ে কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে এখন পথে বসার অবস্থা। শিবেন্দু অণ্ডাল ইয়ার্ডে গুণ্ডাদের হাতে মারাই গেল। অথচ—

—অথচ? সুব্রত জিজ্ঞাসা করল। রুচি গম্ভীর হয়ে যেন তারা শুনছে।

—অথচ তুমি জিজ্ঞাসা করো নাইনথ মার্চের ডিসিশন কে নিয়েছিল, তুমি তার কোনো সদুত্তর পাবে না। যে কোনো ব্রাঞ্চ ইউনিয়নই বলবে আমরা জানিয়েছিলাম যে আমরা প্রস্তুত নই। দু-একজন বললে—ডাক এসেছে। চাকা বন্ধ। নেতৃত্ব বললে, তাই। এ. বি. রেল বি. এ. রেলের ডাকসাইটে ইউনিয়ন খান খান হয়ে গেল। আমার সবচেয়ে রাগ হয় কাদের ওপর জানো সুব্রত, যারা কথা বলে নি।

সুব্রত জানে সবই। তবু চুপ করে রইল। শান্তনু কথা বলুক। সকলকেই জুড়োতে হবে। কথা না বললে জুড়োবে কী করে শান্তনু।

শান্তনু বলে চলল—কেন কথা বলে নি তারা জানো, পাছে কম বিপ্লবী হয়ে যায় তারা, পাছে তারা অ-বিপ্লবী প্রতিপন্ন হয়ে যায়। কত সামান্যের লোভে আমরা সত্যের মুখ চাপা দিই। তত্ত্বজ্ঞানকে চাবি দিয়ে রাখি। কত

জ্ঞান, কত বোধ, কিন্তু মানুষেরই হাতে সে সবের কত বিকার। আমি বলে রাখছি শোনো—এই কঁদিনের মধ্যে আমরা শুনব রমেনের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী ক্লান্তি দেখা দিয়েছিল। জনতার ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল সে। ঐ দিনেই বক্তৃতা করবে পার্টি সেলে।

সুব্রতর মনে পড়ল টুর্গেনিভের ভার্জিন সয়েল বইখানির কথা। টু টার্ন ওভার এ ভার্জিন সয়েল, ইট ইজ নেসেসারি টু ইউজ এ ডিপ প্লাউ গোয়িং ওয়েল ইনটু দি আর্থ, নট এ সারফেস প্লাউ গ্লাইডিং লাইটলি ওভার দি টপ। আমরা যেন বড় বেশি ফেনায় ফেনায় ঘুরে বেড়াই। এরি মধ্যে সুব্রত শুনতে পেল শান্তনু বলছে—আমি চলে যাবো এখান থেকে।

মৃদু স্বরে রুচি জিজ্ঞাসা করলে—কোথায়?

—দূরে, কোনো গ্রামে মাস্টারি নিয়ে।

—পরীক্ষা দেবে না? সুব্রতও জিজ্ঞাসা করল।

—দিলেও সেখান থেকে দোব।

—পাগলামি করো না শান্তদা, সবাই সহ্য করছে আর তোমার…

ক্রোধে অন্ধ হয়ে যেতে ইচ্ছে করল শান্তনুর। তার বদলে ও এমন ভাবে বলল—রুচি, যে, রুচি সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গেল। শান্তনু যেন এই একটা আহ্বানে কিছু বোঝাতে চাইল। তারপরে জিজ্ঞাসা করল সে—কাজলবাবু কে রুচি? সুব্রত চমকে গেল, হলেই বা আত্মীয়, শান্তনুর অভদ্র হবার কোনো অধিকার নেই। আর আচম্বিত আক্রমণে মানুষ যেমন হতবুদ্ধি হয়ে যায় রুচিও সেইরকম স্তম্ভিত হয়ে গেল। তার পরেই সুব্রত দেখতে পেল রুচির মুখখানা নিষ্ঠুর হয়ে যাচ্ছে। বলল—কাজলবাবু অর্থনীতিতে এম. এ., ওঁর অধ্যাপনাটা সখ, বাবার কোলিয়ারি আছে। আমার মায়ের ও বাবার ওঁকে খুব ভালো লাগে। এক নিঃশ্বাসে বলে গেল সে। বিদ্রূপের মতো শান্তনু বলল—আমার তাতে কী?

—তোমার তাতে কিছু হবে কেন? কিছু হলেও শুনছে কে?

রুচি উঠে দাঁড়াল। নদীর দিকে পিছু ফিরে বলল, সন্ধ্যে হয়ে গেছে, যাই। বলে ও উঠে চলে গেল। চুপ করে এমন ভাবে শান্তনু বসেছিল যে সুব্রত ওকে কিছু বলতে পারল না। শান্তনু যেন অপরাধী। সন্ধ্যাটা যেন ওরই হাতে নিহত হল। ঘাটের ওইদিকের এক কোণে কতকগুলো ছেলে জুয়ো খেলে। তাদের উচু গলার ঝগড়া শোনা যাচ্ছে। ঢেউ

তুলে স্টীমার গেল। অনেকক্ষণ ধরে গল্প করে ছুটো ছেলে-মেয়ে নিঃশেষিত হয়ে বাড়ি গেল। দূরের কুলিলাইনে ঢোল বাজছে, গানের আওয়াজ ভেসে আসছে। ওপারে, চুঁচড়োয় কারা মাইকে গান বাজাচ্ছে। এপারে সেই গানের ধুয়ো ধরছে কটি স্কুলের ছেলে। স্থব্রত ও শান্তন্থ বসে রইল অনেকক্ষণ। তারপর শান্তন্থ বলল—যাই আজ। স্থব্রত শান্তন্থকে বাধা দিল না। স্থব্রত ভাবল ও বোধ হয় রুচিদের বাড়ির দিকেই যাবে। কিন্তু শান্তন্থ অন্যদিকের রাস্তা ধরল দেখে স্থব্রত মুখ ফিরিয়ে নিল। আরো অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে স্থব্রত শেষে ঠিক করল রুচির সঙ্গে একবার দেখা করেই যাওয়া যাক।

প্রকাশবাবু বাড়ি ছিলেন না। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির মিটিং ছিল, সেখানেই গেছেন। রুচির মা এইরকম অসময়ে স্থব্রতকে দেখে একটু বিব্রত বোধ করলেন। রুচি রান্নাঘরে। স্থব্রত এসেছে শুনে ছুটে এল। 'আপনি ?'

স্থব্রত বলল—তুমি খুব রাগ করেছ ? স্নিগ্ধ বেলফুলের মতো একরাশ হাসি ছড়িয়ে দিল রুচি।

—শান্তদার কথায় রাগ করতে হলে এতদিন কেঁদেই যেতাম গলে। ও ছোটবেলা থেকেই ওইরকম।

—ওরও মেজাজ খুবই বিগড়েছে। গুম হয়ে চলে গেল।

—চা খাবেন।

—খুব চালাক মেয়ে হয়েছ তো ?

—কেন ?

—তোমার কথার মানে হল ঘড়ি দেখুন এখন ভাত খাবার সময় এবং বাড়ি যান।

—এ মা, আমি তা বলি নি মোটেই, চা খাবেন তো বলুন।

—না, চা এখন থাক। স্থব্রত উঠল। রুচি বলল না আবার আসবেন। স্থব্রত বলল আসি। স্থব্রত দরজার দিকে পা বাড়াল। রুচি ওকে বাইরে এগিয়ে দিতে এল। লোহার হাফ ফটকের ধাতব শব্দটা বেজে উঠল। রুচি বলল—কাজলবাবু সত্যি কেউ নন।

স্থব্রত হেসে ফেলল—কেউ যদি হনই আমার তাতে কী ? তুমি তো জানো আমার অর্থ নেই, নীতি আছে কিনা কে জানে! অধ্যাপনা পেলে

রুচি। রুচি অপ্রস্তুত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। বলল—জানেন শান্তদা সত্যিই রেজিগনেশন দিচ্ছে।

—কে বললে ?

—বাবা। ওকে ছোটবেলায় খেপাতাম অশান্তদা বলে, এখন দেখছি ও সত্যিই তাই।

স্থব্রত ওর দিকে সটান একবার তাকিয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলল তারপর বলল—আচ্ছা, আজ যাই। পথ নির্জন। ঠাণ্ডা। আকাশে বৃষ্টি-ধোয়া ছায়াপথ। শরতের মেয়েলি স্পর্শ বাতাসে। দূরে বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। স্থব্রত দৌড়ল।

শান্তন্থ ওর ঘরের সামনে রোয়াকে বসেছিল। এটা বাইরের ঘর। রোয়াকটা বাইরের দিকে। সামনে ঘোষপাড়া রোড। ব্যারাকপুরের দিকে চলে গেছে। অনেক রাত্রে এই রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে শান্তন্থ বসে থাকে। বাইরের দরজার একটা চাবি থাকে ওর কাছে। প্রায়দিনই ওর ফিরতে রাত হয়। টেবিলে রাত্রির খাবার ঢাকা থাকে। ও খেয়ে নিয়ে বাইরের রোয়াকে বসে। নির্জন নিঃশব্দ রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সিগারেট খায় আর নিজের সঙ্গে আপোস করার চেষ্টা করে। ইজিচেয়ারটাকে রোয়াকের ওপর পাতে। ঘরের জানলার কাছেই। দরকার হলে জানলায় পড়বার আলোটা জ্বালিয়ে নেয়। পড়তে ইচ্ছে না হলে আলো নিবিয়ে দেয়। পঞ্চাশ হাত দূরে একটা মস্ত অশথ গাছ। তারই দিকে তাকিয়ে থাকে। আপোস করতে হয় কেন নিজের সঙ্গে এটাই শান্তন্থর কাছে দুরধিগম্য। আলো-জ্বালানো বোবা রাত্রে অশথ গাছের ডালে পাখিদের পাখা ঝাপটানি শুনতে শুনতে কতবার শান্তন্থর মনে হয়েছে ফিউটাইল—সব কিছুই ফিউটাইল। যে তত্ত্বজ্ঞান কজন সাঁচ্চা মান্থষ অন্তর দিয়ে উচ্চারণ করছে, রূপ দিতে চাইছে কাজে, আরো হাজার জন বদমাইস এবং ভণ্ড ঠিক সেই একই তত্ত্বজ্ঞানকে দোহাই হিসাবে ব্যবহার করছে। এই যে সেদিন পার্টির কেন্দ্রীয় সভার সদস্য আহ্‌লুওয়ালিয়াকে তাড়িয়ে দেওয়া হল, তত্ত্বজ্ঞান তার কিছু কম ছিল ? অথচ পার্টি-বিচার যদি সত্য হয় তাহলে লোকটা স্ত্রীর সঙ্গে ফিউডাল ব্যবহার করত। সারা জীবনের তত্ত্বজ্ঞান তাহলে তাকে আসলে পাল্টাতে পারে নি। আর যদি উল্টোটা সত্য হয়

তাহলেও একই কথা। কেননা দলাদলির মতলবে যদি আহলুওয়ালিয়ার বিপক্ষে ওই সব কথাগুলো বলা হয়ে থাকে তবে বুঝতে হবে মার্কসবাদ কাউকেই পরিবর্তিত করে নি, করে না। শান্তনুর নিজের কথা মনে পড়ল। রুচির ব্যাপারে তার যে দুর্বলতা, যে আকাঙ্ক্ষা তা কি শুধুই রুচিকে সত্যে স্থির দেখার বাসনা? না কি রুচির ব্যাপারে তার নিজেরই কোনো অধিকারস্পৃহা আছে? পনেরো বছরের রুচিকে ছুটোছুটি করে খেলা করতে করতে একবার চুমু খেয়েছিল। সেই নোনতা স্বাদ মুখ থেকে মুছে গেলেও মন থেকে মোছে নি বোধ হয়। অথচ রুচি হেসে ব্যাপারটা ধুয়ে ফেলেছে পরদিনই। ভালো করে রোজ দাঁত মাজতে বলেছিল শান্তনুকে। রমেন দেখতে চমৎকার। শার্ট প্যাণ্টে এত স্মার্ট দেখাত তাকে যে বলার নয়। শান্তনু সে তুলনায় অনেক ভোঁতা। সুব্রত সুন্দর নয়। কিন্তু রোগা লম্বা চেহারায় একটা ম্লান দৃঢ়তা আছে। কিন্তু কাজলবাবু নিঃসন্দেহে এদের সবাইকে হারিয়ে দেয়। শান্তনুর ভেবে কষ্ট হয় রুচি কোথাও স্থির হয় না কেন। রুচি কেন গভীরে যায় না। রমেনকে ঈর্ষা হত শান্তনুর। কিন্তু রুচি যদি অক্লেশে রমেনকে বাদ দিয়ে দেয় তা হলে শান্তনুর কষ্ট হবে। তাই সুব্রত রুচিকে নিয়ে রমেনদের বাড়ি যাক এটা শান্তনু চেয়েছিল। রুচিকে মার্কসবাদে আকৃষ্ট করেছিল শান্তনু। এই অহমিকা থেকে শান্তনু বিদায় নিতে পারে না। অনেক দিকে অনেক পরাজয়ের পর রুচিও বিদায় নেবে সুখ, নিরাপত্তা, স্বস্তির লোভে এটা শান্তনুর কাছে আর এক পরাজয়। রুচি কেন রমেনকেই মনে রাখে না? সেও তো এক হিসাবে শান্তনুরই স্বাক্ষর। কিম্বা সুব্রতকে?

শান্তনুর মা বলেছিলেন, আমার আর সব ছেলেরাই কিছু না কিছু হয়েছে, বড় অফিসার, মেজ ডাক্তার, সেজ এ্যাডভোকেট—ছোটটাই কিছু হল না। শান্তনু মাঝে মাঝে এখন ঐ কথাটা ভাবে—আর সবাই কিছু না কিছু হয়েছে কেবল আমারই কিছু হওয়া হল না। দোতলা বাড়িটার ঘরে ঘরে মেজদা সেজদা বৌদিরা এখন নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। ওরা সকলেই তৃপ্ত। সুখী। অহঙ্কারী। বড় বৌদি একসঙ্গে থাকেন না। বড়দার সঙ্গে জেলায় জেলায় মফঃস্বলে ঘুরে বেড়ান। কচিৎ কখনো আসেন। যখন আসেন তখন তিনি বৌদির প্রচ্ছন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে শান্তনু। অপরে কেমন নির্ঝঞ্ঝাট আয়েসের জীবন কাটাচ্ছে এটা বলার ছলে, সকলেই নিজ নিজ

নিজ জীবনের গৌরব প্রকাশ করতে চাইবেন। বড় বলবেন মেজকে, বেশ আছ তোমরা, সাত ঘাটের জল খেয়ে খেয়ে আমরা আর পারি না। এক একবার বদলি হই, আর আমার ফার্নিচারগুলোর দফা নিকেশ হয়। মেজ বলবেন—এ তবু আছ ভালো, পাঁচটা দেশ দেখে বেড়াচ্ছ, আর আমাদের দেখ না ঘাঁটি ছেড়ে নড়বার উপায় নেই, সব সময় গোটা কত করে সিরিয়াস কেস। কেউই স্বাধীন এ কথা যখন সকলে মিলে সাব্যস্ত করবেন, সেজ বলবেন, বোলো না তাই ওঁর মক্কেলদের টানাটানির ধাক্কায় যাওয়া হয়ে ওঠে না কোথাও, হরিদ্বারে যাব একবার ভাবলাম, ওখানে ওঁর তিন মক্কেলের তিনখানি বাড়ি। এ বলে আমার এখানে চলুন, ও বলে আমার এখানে—যাকেই 'না' বলবেন তারই মুখ ভার—রাগ করে বললেন দূর হোক গে যাক। সেজ একটু কৃপণ। দোহাই দেন দুই মেয়ে, এখন থেকে হাত টানতে হবে। বড় নিঃসন্তান। তিনিও কৃপণ। বলেন ছেলেমেয়ে নেই বুড়ো বয়েসে দেখবে কে বল! যে যার নিজের মতো ছোটখাট অহংকার বানিয়ে নিয়ে সুখে আছে। প্রত্যেকেরই ধারণা তার বিয়েয় তার বাবা সাধ্যের অতিরিক্ত খরচ করেছেন। নিজেরা পিতার কত প্রিয়পাত্রী ছিলেন এ ধারণাটা বোধ হয় তারই মাপকাঠি। 'বাবা তো বলেই দিলেন, ছেলে পছন্দ হয়ে গেলে টাকার জন্য আটকাবে না। এরা বলে এরা কিছু চায় নি। চাইবে কি, বাবা চাইতে দিলে তবে তো।' হেসে, নরম করে সৌজন্যের মোড়কে সেই সব অহঙ্কার বিনিময় দেখে দেখে শান্তনু ক্লান্ত।

শান্তনু সেখানে অনাত্মীয়। সে সমস্ত কথাবার্তা তার কাছে অবোধ্য। সে শুধু যা কোনো কাজে লাগে না সে ধরনের এক অতীত বিদ্যার ব্যর্থ এম. এ.। জেল ফেরত হয়ে ওদের সঙ্গে দূরত্বটা যেন আরো বেড়ে গেছে। অথচ ওঁরা তো কেউ লোক খারাপ নন। এখনো যদি দীর্ঘ কারাবাস শেষ করে যখন এই বড় বাড়িটার দরজার কাছে শান্তনু দাঁড়ায়—বৌদিদের অভ্যর্থনা পরস্পরকে ছাড়িয়ে যেতে চায় এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। চাই কি শান্তনুর প্রসঙ্গে মেজ বৌদি হয়তো তাঁর খুড়তুতো কাকার গল্প শোনাবেন, যিনি কুড়ি বছর আগে স্বদেশী করতেন, এখন কিছু করেন না, কিন্তু খদ্দর পরেন ঠিক। লোক সত্যিই ওঁরা খারাপ নন। এখানে ছেলেরা কেরিয়ার তৈরি করে, মেয়েরা রবীন্দ্রসংগীত শেখে। কেরিয়ার তৈরি করা এমন কি খারাপ কথা, রবীন্দ্রসংগীত শেখা তো যাকে বলে ভালোই। ভালো নয় যেটা তা হল ছাঁচ। ছাঁচ মানেই

কৃত্রিমতা। কৃত্রিমতা—কৃত্রিমতা—কৃত্রিমতা। বড়দা মেজদার সাহিত্য-আলোচনা শুনেছে শান্তনু। যাযাবরের 'দৃষ্টিপাত' বইখানা তখন বেরিয়েছে। বইখানার ভালোমন্দ, সে কেবা জানে, কেবা খোঁজ রাখে। বইয়ের লেখক কে, দিল্লিতে তিনি কোথায় চাকরি করেন, লিখতে হলে এই রকম স্টার বই লেখাই উচিত—এই সব। শান্তনুর সনেট লেখা বাতিককে শুনিয়েই বোধ হয় বলেন—লিখলে শিবনাথবাবুর মতো লেখাই উচিত। আলিপুরে বাড়ি, গাড়ি, মন্ত্রীসভায় ঠাঁই। সব কিছুরই একটা প্রসপেক্‌ট থাকা চাই। ছাঁচ—ছাঁচ—কৃত্রিমতা। বোঝে না কৃত্রিমতাই প্রকৃত প্রস্তাবে স্থবিরতা। প্রকাশবাবুদের স্কুলে মাস্টারি নেওয়াটা ওদের কাছে কেবলমাত্র বাহাদুরি। ও যে দলের কাজ করে এটা তবু বাড়ির লোকে সহ্য করেছে। কিন্তু মাস্টারি নেওয়াটা একেবারেই বরদাস্ত করে নি। বড়দা কিছুতেই বুঝতে পারেন না যে কিসের জন্য ও কেরিয়ারটাকে নষ্ট করল। শান্তনুর নিজের কাছেও কি বোধগম্য হচ্ছে? আগে যে আবেগে বোধগম্য হত, ঠিক তেমন করে?

(ক্রমশ)

পীট সীগরের গলায়

: আমেরিকার নিগ্রো সমানাধিকারবাদীর গান

আমরা করব জয়, আমরা করব জয়,
আমরা করব জয়, সে-একদিন
আহা, আমার বুকের গভীরে (আমি জেনেছি যে)
আমি রেখেছি তো বিশ্বাস (আহা—),
আমরা করব জয়, সে-একদিন।

আমাদের নেই ভয়, আমাদের নেই ভয়
আমাদের নেই ভয়, আজ-এইদিন,
আহা, আমার বুকের গভীরে, আমি রেখেছি তো বিশ্বাস
আমরা করব জয়, সে-একদিন।

আমরা যে নই একা,…(আজ-এইদিন)
আহা, আমার বুকের গভীরে, আমি রেখেছি তো বিশ্বাস
আমরা করব জয়, সে-একদিন।

আমরা যে হব মুক্ত, সত্যে মুক্ত…
আমরা করব জয়, সে-একদিন।

আমরা হাঁটব হাতে-ধরে-হাত, পথ…
আমরা করব জয়, সে-একদিন।

সহায় থাকেন প্রভু, আমরা অব্যাহত…
আহা, আমার বুকের গভীরে, আমি রেখেছি তো বিশ্বাস
আমরা করব জয়, সে-একদিন॥

We shall overcome, we shall overcome
We shall overcome someday.
Oh, deep in my heart (I know thát)
I do believe (Oh—), we shall overcome someday.

We are nor afraid, we are nor afraid
We are nor afraid, today.
Oh, deep in my heart, I do believe
We shall overcome someday.

We are not alone···('today)
Oh, deep in my heart, I do believe
We shall overcome someday.

The truth will make us free···
We shall overcome someday.

We will walk hand in hand···
We shall overcome someday.

The Lord will see us through···
Oh, deep in my heart, I do believe
We shall overcome someday.

বঙ্গানুবাদ : সিদ্ধেশ্বর সেন

আজিজুল হক আল আহসান

ওকে বাঁচিয়ে রেখ

ওকে বাঁচিয়ে রেখ
বাঁচার ইতিহাস পল্লবময়, পয়মন্ত ছেলে
হোয়াইট হাউস ট্রিওলেট গুচ্ছে সূর্যের গতায়াত
ক্রেমলিন বাতায়নের দিকে অবাধ চোখ মেলে।
আণবিক আগ্নেয় স্বগতোক্তির ভিড়ে
এবং দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ
যাযাবর ফিনিক্স ফিরবে আপন নীড়ে
ধিক্কৃত, কেঁপে যাবে জল্লাদ।

শিশিরকুমার দাশ

ফেলে যেও না

ওকে তোমরা ফেলে-যেও না নির্জন এই দ্বীপ
কালো পাহাড়, খাড়া পাহাড়, ন্যাড়া পাহাড়
ও যে এখন ঘুমিয়ে আছে, গভীর খাদের পাশে
ওর মুখে নীল দিনের আলো, নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে
ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে যায় যে, দূরেই সাদা হাড়
অজানা কোন অভাগা নাবিকের, একটা জাহাজের
মাস্তুলের শবদেহের, শব্দ শুধু অচঞ্চল জল।

ওকে তোমরা ফেলে যেও না নির্জন এই দ্বীপ
কালো পাহাড়, খাড়া পাহাড়, ন্যাড়া পাহাড়
ও যে এখন ঘুমিয়ে আছে, একটা মৌমাছি
গুনগুনিয়ে গুনগুনিয়ে মুখের কাছাকাছি
উড়ে যাচ্ছে কখন থেকে, বহুদূরের চিল

আকাশ থেকে ডানার ছায়া ফেলছে ওর মুখে
ভীষণ রোদ, সমুদ্র আজ উত্তাল উচ্ছল।

ওকে তোমরা ফেলে যেও না, শোন, শোন, শোন
কালো পাহাড়, খাড়া পাহাড়, ন্যাড়া পাহাড়,
ও যে এখন ঘুমিয়ে আছে, একটু আগেই ওর
ভালবাসা হারিয়ে গেছে, সমুদ্রের জলে,
জেগে উঠবে খুঁজবে সেই হারানো ভালবাসা,
শিশুর মত, ক্ষ্যাপার মত, কাঁদবে সারারাত
ফিরবে ঘরে কেমন ক'রে, সমুদ্র উন্মাদ
চিবিয়ে খায় ভালবাসার অস্থিমজ্জা হাড়॥

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

মর্মরমূর্তি

খর্জুর শাল্মলী তরুচ্ছায়া,—পার্শ্বে প্রশস্ত উদ্যান
দর্পিত প্রাসাদ, দ্বারী বিচিত্রভূষায় সুসজ্জিত।
সিংহদ্বারপ্রান্তে দৃশ্য দীর্ঘশোভা : ফোয়ারা উচ্ছ্রিত
দিব্যশ্রী, চঞ্চল মাছ জলাশয়ে, মর্মর সোপান।
রঙিন প্রস্তরখণ্ড আচ্ছাদিত পথ অভ্যন্তরে।
কচি ঘাস প্রসারিত বিসর্পিল দূরে ইতস্তত।
ভিন্‌দেশী অন্তর্বর্তী হলে ভ্রমে হবে প্রতিহত
কারণ, সতর্ক সদা সারমেয় উদ্যত নখরে।

দুর্ভেদ্য প্রাসাদ। তবু একদিন প্রার্থিত ভ্রমণে
আমন্ত্রিত, পৌছালাম। পরিদৃশ্যমান দৃশ্যে চোখ
ম্রিয়মান। শুধু এক পরিত্যক্ত ভাস্কর্য—স্বর্লোক :
একটি মর্মরমূর্তি আবিষ্কার লতাগুল্মবনে।

একটি নিপুণ শিল্প : প্রস্তরিত মুখ—সন্নিধানে
অন্যান্য বৈচিত্র্য ভুলে যাই—এই সৌন্দর্যের টানে॥

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

কৃতকর্ম

রুটিন-মাফিক হাঁটা-চলা, এই অপূর্ণতার
মধ্যে বাজলো বাঁশি ;
এক ফুঁয়ে শুধু ঘুরলো বাল্য, সন্ধ্যামালতী,
জন্মভিটার
কে বললে, এই আসি !

চাকায় জড়ালো ভালোবাসবার কথা ও ছন্দ,
প্রাণহীন, দেহাতীত !
থেকে-থেকে বাজে কীর্তনীয়ার করতাল, আর
মধুর মন্দ
ভূমধ্য সংগীত।

দেখি প্রকাণ্ড ছায়া পড়ে যায় ; কৃতকর্মের
ফল খাই আদ্যন্ত।
বাহবা দেবার লোক ছিলো বটে, কিন্তু তাহার
সমপর্ণের
মতো নই প্রাণবন্ত।

ভূতলে যখন ঘণ্টা বাজাও, আমার শ্রবণ
নেমে যায় দ্রুত বনে ;
আমি যার প্রতি জটিল এবং জর্জরিত
তাদের ভ্রমণ
দিগ্বালিকার ধনে !

এক দেয়ালের মধ্যে এখন দিবসরজনী,
পূর্ব ও পশ্চিম।
সর্বস্ব কি আছে আর ঐ দূর প্রাঙ্গনে ?
আমার রমণী
বুকের রক্তে হিম।

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

আর একদিন পরে

বাহির মহলে আর কেবা শোনে মহতী সঙ্গীত ?
অবান্ধব অন্দরে বাহিরে
চন্দ্র মল্লিকার বুকে মাথা রেখে শুয়েছি যখন
বাতায়ন খুলে দিলো বাতাসের সঙ্গে চরাচর
অভিমান ভুলে গিয়ে। ঔপনিবেশিক বিহগেরা
প্রতিবন্ধকতাহীন বৃক্ষের শরীরে
কেন বারবার কেন আলোর সদিচ্ছা নিয়ে আসে ?

কোনো স্থিত, কোনো স্থিরতর মৃদু জলের ভিতরে
সমগ্র মধ্যাহ্ন আর সব অপরাহ্ণ খেলা করে।

শিরা উপশিরা ছিঁড়ে যাবতীয় সকল সঙ্গীত
সংঘবদ্ধভাবে ধায় হৃদপিণ্ডের অন্দর মহলে,
নিজের রুধির কিংবা বন্ধুর শোণিত
অবশ্য পৃথকভাবে চেনা যায়। কারণ সকলে
একই রক্তস্রোত আর বক্ষদেশে বহন করে না।

গভীর ঘুমের মধ্যে রৌদ্রের আলস্যভরা দিন
ক্রমশ সমস্ত মুখ বন্ধনবিহীন।

শেষবার দেখা হোলো কৃষ্ণপক্ষে অরণ্যসভায়
বনস্পতি-দেহ অন্ধকার,
পিছু হটবো না আমি কোনোদিন ফেরাবো না মুখ
প্রতিশ্রুতি তার।

রমানাথ রায়

...বোধ্য

আজকাল প্রায়ই আমার মাথা ধরে, চোখ দিয়ে জল পড়ে। একটু ঘুরলে কিংবা বেশি কথা বললে মাথার মধ্যে দপদপ ...রে মনে হয় মাথার শিরাগুলো বুঝি ছিঁড়ে যাবে। আর যদি একটু ...ার ইচ্ছে হয়, কোনো বইয়ের পাতা চোখের সামনে মেলে ধরি, অমনি ...ক্ষণের মধ্যে দু-চোখের পাশ দিয়ে টসটস করে জল পড়তে শুরু ...য়। অবশ্য এই অসুখটা আমার নতুন নয়, অনেকদিনের পুরনো। ...েই মাঝে মাঝে দেখা দেয়। তবে আজকাল অসুখটা বেড়েছে।

...এই অসুখটা যখন আমি আবিষ্কার করেছিলাম, তখন আমার বয়স ...রো। ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে তাকিয়ে যখন ক্লাসের সবাই অঙ্ক টুকে নিত, ...মি তখন পেন্সিল মুখে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকতাম। মাস্টারমশাই ...্ল্যাকবোর্ডে অঙ্ক কষে দিচ্ছেন, আমি সেদিকে তাকিয়ে কালো বোর্ডের ...ওপর শাদা খড়ির দাগ দেখার আপ্রাণ চেষ্টা করতাম, কিন্তু সমস্ত কিছু ...ার মধ্যে দূরের গাছপালার মতো ঝাপসা ঠেকত, কিছু পড়তে পারতাম ...া। ফলে, নিজের ওপর ক্ষোভ জন্মাত। কিন্তু কেন যে আর পাঁচজনের ...তো পরিষ্কার ভাবে কিছু দেখতে পাচ্ছি না, তার কারণ বুঝতে পারতাম ...া। এক-একবার মনে হত, আমার হয়তো চোখ খারাপ হয়েছে। মাঝে ...মাঝে ভাবতাম, বাড়িতে এই কথাটা জানানো দরকার। কিন্তু কেউ ...বিশ্বাস করবে না ভেবে আর জানাই নি। বস্তুত, আমাদের বাড়ির কারোর ...চোখে চশমা নেই, প্রত্যেকেই সমস্ত কিছু পরিষ্কার দেখতে পায়। আর ...সেই বাড়ির ছেলে হয়ে আমার চোখ খারাপ হয়েছে, এর মতো অবিশ্বাস্য আর ...কি হতে পারে ?

...তবে শেষ পর্যন্ত এই গোপন ব্যাধির কথা বাড়িতে না বলে পারি নি। ...বলতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমার না দেখতে পাওয়ার অসুবিধে যদি ক্লাসের ...মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত, তাহলে হয়তো বাড়িতে একথা বলতাম না। কিন্তু

সকলে যখন রাত্রে এক আকাশ তারা দেখত, দেখত সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত, কিংবা বর্ষার মেঘ, তখন আমি বোকার মতো চোখ মেলে চারদিক হাতড়ে বেড়াতাম। কিছুই দেখতে পেতাম না; তারা দূরের কথা, চাঁদটাও খুব ভালো করে চোখে পড়ত না। আমার খুব কষ্ট হত। এক-একদিন রাতের আকাশের দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপলক তাকিয়ে থেকেছি, মুহূর্তের জন্যেও যদি চাঁদটা হঠাৎ আমার চোখে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তার অপেক্ষা করেছি, কিন্তু কোনোদিন ভুলেও চাঁদটাকে অস্পষ্ট ধূসর একটা আলোর তাল ছাড়া কিছু ভাবতে পারি নি। তাই বইয়ের ছবি দেখে, লোকের মুখে শুনে কল্পনা করেছি রাতের বিজন আকাশ, চোখ বন্ধ করে দেখতে চেয়েছি, নক্ষত্রেরা মুক্তোর মতো ছড়িয়ে আছে, আর তার মাঝখানে এক অলৌকিক স্তব্ধতা নিয়ে চাঁদ থমথম করছে। কোনো কোনোদিন ভাবতে চেষ্টা করেছি, বৈশাখ মাসে ঝড় উঠলে কি ভাবে মেঘ আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত গড়াতে গড়াতে নিজেকে চতুর্দিকে বিস্তার করে দেয়। কখনও ভেবেছি সূর্যোদয়ে কিংবা সূর্যাস্তে গোটা আকাশ কিরকম অদ্ভুতভাবে রঙের রহস্যে অলৌকিক হয়ে ওঠে। আমি প্রতিদিন সেই সব রহস্যময় দৃশ্যের কথা ভেবেছি যা দূরের এবং আমার দৃষ্টির অগোচর, কিন্তু সে সব দেখতে পেতাম না বলে আমার কষ্টের সীমা ছিল না। আর এই কারণেই শেষ পর্যন্ত আমার অসুখের কথা বাড়িতে না জানিয়ে পারি নি। তারা আমার কথা শুনে প্রথমে খুব অবাক হয়েছিল। তারপর নানাভাবে আমার দৃষ্টিশক্তির পরীক্ষা করে শেষে বুঝতে পারল যে আমার চোখ খারাপ হয়েছে, এ অসুখ বানানো নয়; তারা বিশ্বাস করল, আমি দূরের জিনিস সত্যি সত্যি দেখতে পাই না, যা তারা অনায়াসে চোখ তুললেই দেখতে পায়।

তারপর তারা আমায় লাল টাই-পরা এক ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। ডাক্তার আমার চোখ পরীক্ষা করে বলেছিলেন, আমার চোখ অস্বাভাবিক রকমের খারাপ। আমি তখন তাঁকে আচমকা জিজ্ঞেস করেছিলাম, আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আমার চোখ এত খারাপ হল কেন? তিনি এই প্রশ্নে আমার দিকে ক্ষণেকের জন্য চোখ তুলে নামিয়ে নিয়েছিলেন। এর কোনো জবাব দেন নি। জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নি। আমিও ভয়ে দ্বিতীয়বার আর জিজ্ঞাসা করি নি।

এর ঠিক দু-দিন পরে তিনি আমায় একটা চশমা দিয়েছিলেন। সেই

চশমা চোখে দিয়েই মুহূর্তের মধ্যে আমার সমস্ত বোধ পাল্টে গিয়েছিল। গোটা পৃথিবী হঠাৎ এত বেশি নগ্ন হয়ে উঠেছিল যে সহ্য করতে পারি নি, চশমা চোখে দিয়েই খুলে রাখতে হয়েছিল। অবশ্য ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, এরকম কয়েকদিন হবে, তারপর আস্তে আস্তে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।

বাস্তবিক, চশমাটা আমার জীবনে এক নিষ্ঠুর পরিবর্তন এনেছিল। গাছপালা, ঘরবাড়ি, লোকজন সবকিছুর চেহারা রাতারাতি পাল্টে গিয়েছিল। সবকিছু আমার কাছে বড় বেশি অচেনা বলে মনে হয়েছিল। এমন কি নিজের বাড়ি, ঘরদোর, বাবা মা প্রত্যেকেই, যাদের সঙ্গে জন্ম থেকেই পরিচিত, তারাও আমার অপরিচিত হয়ে উঠেছিল। বাড়ির রঙ যে এত মলিন তা কোনোদিন ভাবি নি, বাবার মুখের অদ্ভুত কালো কালো দাগ আমার অগোচর ছিল, মাকে যে এত রোগা আর কালো দেখতে তা ধারণা করতে পারি নি। নিজের বাড়ি ও বাবা মাকে এতকাল কি অদ্ভুত ভাবে কল্পনা করে এসেছি, তা মনে করে আমার চোখ ফেটে জল এসেছে। মাঝে মাঝে ভেবেছি, চশমাটা না নিলেই হত। কখনও কখনও ক্ষোভে দুঃখে চশমাটা ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে হয়েছে; কিন্তু পারি নি, কেননা এই চশমা পরেই ভালো করে রাতের আকাশ দেখেছি, বর্ষার মেঘ দেখেছি, দেখেছি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত।

এবং সেই থেকে আজও আমার চোখের ওপর চশমাটা রয়ে গেছে। এর মধ্যে বহুবার আমার মাথা ধরেছে, চোখ দিয়ে জল পড়েছে, এবং চশমার কাচও যে কতবার পাল্টেছি তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু আজও বুঝতে পারি নি, এত করেও আমার অসুখ কেন তেমনি রয়ে গেল।

অবশ্য এই বয়সে চোখের অসুখের ধরনটা একটু অন্যরকম। এক সময় আমি যা কিছু দূরের এবং ঝাপসা, তা স্পষ্ট করে দেখার জন্যে চশমা নিয়েছি এবং সেই চশমা পরেই আমি তখন সবকিছু বড় স্পষ্ট করে দেখতে পেয়েছি, যার অনেককিছু হয়তো অত স্পষ্ট করে না দেখতে পেলেই ভালো হত। তবে এই বয়সে দূরের নয়, কাছের জিনিস আর তেমন ভালো করে দেখতে পাই না। কেমন ঝাপসা ঠেকে। বই কিংবা খবরের কাগজ পড়তে বসলেই, চোখ টনটন করে, মাথা ধরে। প্রথম প্রথম ভেবেছিলাম, ডাক্তারের কাছে যাব না; কেননা, আমার মনে হয়েছে এ অসুখ আমার সারবে না, সারবার নয়।

কিন্তু অসুখটা দিনে দিনে বেড়ে যাওয়ায় আমার কেমন ভয় হতে লাগল। মনে হল, আমি হয়তো অন্ধ হয়ে যাব। তাই শেষ পর্যন্ত আমায় এক ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হল। ডাক্তার প্রায় তিনদিন ধরে আমার চোখ পরীক্ষা করলেন; করে যে চশমা দিলেন তাতে আমি ফের ছাপা হরফ পড়তে পারলাম। আর ঝাপসা ঠেকল না। চশমা চোখে নিয়ে আমি ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলাম, চশমা কি আর পাল্টাতে হবে? নাকি এতেই চলে যাবে?

ডাক্তার গম্ভীর মুখে বললেন, বোধ হয় আর পাল্টাতে হবে না।

কথাটা শুনে আমার আনন্দ হল। কেননা, ডাক্তারের কথায় যেন মনে হল, আমার চোখের অসুখ তাহলে সেরে যাবে। ডাক্তারের মুখের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে নীরবে ধন্যবাদ জানালাম।

বাস্তবিক, আমি কয়েকদিন ধরে বেশ লক্ষ্য করলাম যে বইয়ের পাতা ওল্টাতে গিয়ে চোখের পাশ দিয়ে আর জল গড়িয়ে পড়ে না। কিংবা হঠাৎ অকারণে আর মাথা ধরে না। এটা লক্ষ্য করে মনে মনে স্বস্তি পেলাম। বুঝলাম, এখন আমার সত্যি সত্যি চোখের অসুখ সেরে গেছে। এবং এ সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ রইল না। এখন ছাপা হরফ যেমন স্পষ্ট দেখতে পাই, তেমনি দূরের মেঘ কিংবা নক্ষত্রও দেখতে পাই। সবকিছুই, অর্থাৎ বাইরের এই চোখটা দিয়ে যা দেখা সম্ভব, এবং সকলেই যা দেখতে পায়, তা এখন আমিও দেখতে পাই। কোনো অসুবিধে হয় না।

কিন্তু হঠাৎ একদিন রাত্রিবেলা বাড়ি ফিরে টের পেলাম, মাথার ভেতর দপদপ করছে। কেমন ভয় পেয়ে গেলাম। কিছুতে বুঝতে পারলাম না, ফের আমার মাথা-ধরা শুরু হল কেন? কিছুক্ষণের মধ্যে মাথার যন্ত্রণা তীব্রতর হয়ে উঠল। ঘুমুতে গিয়ে ঘুম এল না। যন্ত্রণায় বিছানার ওপর কেবল এপাশ-ওপাশ করতে লাগলাম।

শেষে থাকতে না পেরে কপালের ওপর ভালো করে নীল মলম লাগিয়ে দিলাম। লাগিয়ে দিতে বেশ আরাম বোধ করলাম। কেমন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছিল। আস্তে আস্তে মাথার ভিতরের প্রচণ্ড দপদপানি কমে এল। আর ঠিক সেই সময় আমি কখন যেন ঘুমিয়ে পড়লাম।

কিন্তু পরদিন রাতে আবার মাথা কামড়াতে শুরু করল। দু-চোখের পাশ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে গালের ওপর জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। বুঝলাম, আবার চোখ খারাপ হয়েছে এবং এই অসুখের হাত থেকে আমার রেহাই নেই, ব্যাধের মতো সারাজীবন আমাকে ধাওয়া করবে।

একদিন ফের সেই ডাক্তারের কাছে গেলাম। তিনি অনেক্ষকণ ধরে আমার চোখ পরীক্ষা করে দেখলেন, আমি নির্ভুলভাবে সমস্ত কিছু দেখতে পাই কিনা। দূরের এবং কাছের কোনো অক্ষর পড়তে আমার অসুবিধে হয় কিনা। এতে তিনি অনেকটা বিহ্বল হয়ে পড়লেন। কি করবেন ঠিক করে উঠতে পারলেন না। এই সময় তাঁকে বড় অসহায় দেখাচ্ছিল। তবু তিনি শেষ পর্যন্ত আশ্বাস দিয়ে একটা ওষুধ আমাকে নিয়মিত ব্যবহার করতে বললেন।

আমি সেই ওষুধ তাঁর কথামতো প্রায় ঘড়ি ধরে ব্যবহার করলাম। কিন্তু অসুখ আমার তেমনি রয়ে গেল। মাথা-ধরা কিংবা চোখ দিয়ে জল পড়া বন্ধ হল না।

আবার ডাক্তারের কাছে গেলাম। তিনি ফের ওষুধ দিলেন। কিন্তু কিছু ফল হল না। এবং তাঁকে বিশ্বাস করে এভাবে আমার বহুদিন চলে গেল।

শেষে ধীরে ধীরে নিজের কাছে নিজের অসুখ বড় দুর্বোধ্য আর রহস্যময় বলে মনে হতে লাগল। কিছুতে বুঝতে পারলাম না, আমি এখন এই বয়সে এমন কোন্ অলৌকিক দৃশ্যের অপেক্ষা করব, যার জন্যে আমার মাথা ধরে, চোখ দিয়ে জল পড়ে।

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

ডব্লু. ই. বি. দুবয় ও নিগ্রো স্বাধিকারের দাবী

> "Blessed are the Peacemakers, for they shall be called communists. Is this shame for the Peacemakers or praise for the communists? Accursed are the communists, for they claim to be Peacemakers. Is this shame for the communists or praise for the peacemakers? This is the paradox which faces America."—W. E. B. Dubois, 1952.

সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে স্বাধিকারের দাবীতে নিগ্রো সমাজের আন্দোলন ক্রমশ বলীয়ান হয়ে উঠতে লাগল। আর প্রায় সেই মুহূর্তেই সেই আন্দোলনের অন্যতম আদিপুরুষ ডক্টর দুবয়ের মৃত্যু হল। এবারের আন্দোলনের পশ্চাতে প্যান্-আফ্রিকান চেতনার যে ভূমিকা আমরা লক্ষ্য করেছি, সেই প্যান্-আফ্রিকান আন্দোলনেরও প্রতিষ্ঠাতা ও আদি সংগঠক ডক্টর দুবয়; তাঁরই নেতৃত্বে ১৯১৯ সালে প্রথম প্যান্-আফ্রিকান কংগ্রেস প্যারিতে অনুষ্ঠিত হয়। যে-ইতিহাস এই আন্দোলনের পটভূমিকা, সেই ইতিহাসের মধ্যে ডক্টর ডব্লু. ই. বার্গহার্ট দুবয় ওতপ্রোতভাবে মিশে আছেন। নিগ্রো সমাজের পক্ষ থেকে পল রোবসন ১৯৫৮ সালে তাঁর আত্ম-কথার পাতায় যে কথা বলেন, তার সত্যতাই বোধ হয় ডক্টর দুবয় সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা। রোবসন বলেছিলেন, "তিনি আমাদের মুক্তি আন্দোলনের জনক।···তিনি আমাদের শতাব্দীর যথার্থ মহৎ আমেরিকানদের অন্যতম।" ৯৫ বছর বয়সে যার জীবনাবসান হল, তাঁর জীবনের ছিয়াত্তর বছর নিগ্রো সমাজ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের অঙ্গ।

১৮৮৮ সালে ফিস্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়ে বেরুবার আগেই উনিশ বছর বয়সে, অর্থাৎ ১৮৮৭ সালে দুবয়ের রাজনৈতিক কার্যকলাপের শুরু (ওঁর নিজেরই মতে)—মদ্যপান-নিবারণী আন্দোলনের প্ল্যাটফর্মে। তখনও কিন্তু দুবয় আসলে নিষ্ঠাবান ছাত্র, দেশীয় বা জাতীয় রাজনীতিতে প্রায় একেবারেই অনুৎসাহী। তারপর হার্ভার্ডে কাটল চার বছর। এখানে দুবয় দর্শন,

ইতিহাস ও মনস্তত্ত্বে শিক্ষা নেন উইলিয়ম জেম্স্, জোসিয়া রয়েস্, জর্জ সান্টায়ানা, এবং অ্যালবার্ট বুশনেল হার্ট প্রমুখ দিকপালদের কাছে। এখান থেকে তিনি আদর্শ হিসেবে বেছে নেন "শুধু জ্ঞানাহরণ"। ১৮৮৯ সালে মার্কিনের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দুবয় তাই প্রায় উদাসীন! "আমার সব চিন্তা তখন পড়াশোনায়; নতুন রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে তখন কী বলেছিলাম, কী করেছিলাম; তার প্রায় কিছুই মনে পড়ে না।" সে-আমলে মার্কিন ছাত্রদের রেওয়াজই ছিল ইওরোপে পড়তে যাবার। কিন্তু ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তখনও মার্কিনী ডিগ্রি স্বীকার করে না। দুবয়ের শখ ছিল জর্মনি যাবার। স্লেটার ফাণ্ডের স্কলারশিপের দৌলতে সেই সুযোগ জোটে। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠকালেই (১৮৯২-১৮৯৪) গুস্তাফ শ্মোলারের কাছে দুবয় শিখলেন যে, অজ্ঞতাই বর্ণবৈষম্যের উৎস, এবং বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধানের মাধ্যমেই সত্যকে প্রকাশ ও প্রচার করলেই সমাধানের দিকে এগোনো যায়। ফিরে এসে হার্ভার্ডে দুবয় তাঁর গবেষণার পরিণতিস্বরূপ 'আফ্রিকার দাস-ব্যবসায়ের দমন' সম্পর্কে প্রবন্ধের জন্য ডক্টরেট লাভ করেন। ১৮৯৬ সালে নতুন 'হার্ভার্ড ঐতিহাসিক বিচার' পর্যায়ের প্রথম বই হিসেবে এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। শ্মোলারের শিক্ষাই তখনও তাঁর মনে কাজ করছে। ১৮৯৯ সালে পেন্সিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয় 'ফিলাডেলফিয়ার নিগ্রো: একটি সামাজিক সমীক্ষা'। তখনই তিনি আটলাণ্টা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্বের অধ্যাপনার কাজ নেন। এখানে তিনি অধ্যয়নের ও গবেষণার একটি বিশেষ পরিকল্পনা চালু করেন—মার্কিনী নিগ্রো সম্পর্কে এই শিক্ষাক্রম হবে "মূলত বিজ্ঞানানুসারী—সঙ্গতি ও মানসিক ক্ষমতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সততার সঙ্গে গভীরভাবে ও ব্যাপকভাবে সত্যের সন্ধান"। আটলাণ্টায় এই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ চলতে থাকে, ডক্টর দুবয়ের পরিচালনায়। এই সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতেই ১৯০৩ সালে প্রকাশিত হয় 'দ্য সোল্স্ অফ্ ব্ল্যাক্ ফোক্'। ফিস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় দুবয় ছুটিতে ছুটিতে টেনেসি প্রদেশে গ্রামের ছোট ছোট নিগ্রো স্কুলে শিক্ষকতা করেছিলেন; সেই অভিজ্ঞতাও তাঁকে তথ্য যুগিয়েছিল। কিন্তু এই ১৯০৩ সালেই দুবয়ের মনে হতে থাকে, শুধু সত্য ঘোষণাতেই "সমাজ সংস্কার ত্বরান্বিত হয় না।"

ওদিকে তখন বুকার ওয়াশিংটনের আবির্ভাব হয়েছে। আলাবামায়

তাঁর টাস্কেগী স্কুলে তিনি নিগ্রোদের লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিগ্রো হিসেবে হীনতর সামাজিক মর্যাদায় সন্তুষ্ট থাকবার শিক্ষা দিতে থাকেন। আর এখানে চরম লক্ষ্য ছিল নিগ্রোদের দক্ষ রাজমিস্ত্রী, পাচক, ক্ষেতমজুর, ও মেকানিক করে তোলা, আর কিছুই নয়। বুকার ওয়াশিংটন দক্ষিণীদের বুঝিয়ে দেন যে, তাঁর পাঠশালায় আসলে নিগ্রোদের বিষদাঁত ভেঙে সাহেবী কর্তাদের জন্য তাদের প্রস্তুত করে তোলা হয়। এখানকার শিক্ষক ডক্টর ই. ফ্র্যাংকলিন ফ্রেজিয়ার 'নিগ্রো বিপ্লবের' ইতিহাসকার লুই লোমাক্সকে বলেন যে, সাহেবরা যাতে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে এখানে নিগ্রোদের চিন্তা করতে দেওয়া হয় না, সেজন্য ওয়াশিংটন যে-কোনো পন্থা অবলম্বন করতে প্রস্তুত ছিলেন। ১৯১৬-১৯ ৭ সালে ফ্রেজিয়ার একদিন স্কুলের ভিতরে একতাড়া বই নিয়ে চলতে গিয়ে ওয়াশিংটনের ধমক খান। ওয়াশিংটনের ভয়, তাঁর হাতে এত বই দেখে সাহেবরা পাছে ভাবে যে এখানে নিগ্রোদের হাতের কাজ না শিখিয়ে তাদের বুদ্ধিতে শান দেওয়া হচ্ছে। উচ্চশিক্ষার বদলে শুধুমাত্র কারিগরি শিক্ষার এই পরিকল্পনায় নিগ্রোর সমানাধিকারের দাবিকে চাপা দিয়ে সামাজিক মর্যাদায় তার হীনতাকে স্থায়ী করে তোলার চেষ্টা হয়, আর সঙ্গে সঙ্গেই কিছুটা আর্থিক সচ্ছলতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। অর্থাৎ, কার্যত এই আপোসরফায় সামাজিক হীনতাকে মেনে নিয়ে শ্বেতাঙ্গ সমাজের কাছ থেকে কিছুটা আর্থিক সুবিধা আদায় করার চেষ্টা হয়। রাজনৈতিক অধিকার, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও উচ্চশিক্ষাকে বিসর্জন দিয়ে 'টাকা করার' এই পরিকল্পনা, আত্মাবমাননার এই সর্বনাশা নীতির বিরুদ্ধে প্রথম বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানান ডক্টর ডুবয়। তিনি বলেন: "নিগ্রোদের শিক্ষার প্রশ্নে প্রথমেই জোর দিতে হবে সমাজের প্রতিভাবান দশমাংশের উপর। এই সমাজের শ্রেষ্ঠ অংশকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে এঁরা নিজেদের সমাজের বা বাইরের হীনতম অংশের বিষাক্ত প্রভাব ও মারণপদ্ধতি থেকে এই সমাজের বৃহত্তম অংশকে বাঁচিয়ে রাখার মতো সুযোগ্য নেতৃত্ব দিতে পারেন।" ডুবয়ের পক্ষে সমর্থক জোটে মুষ্টিমেয়—উত্তরের কিছু নিগ্রো বুদ্ধিজীবী, আর শ্বেতাঙ্গ অ্যাবলিশনিস্টদের শেষ কয়েকজন প্রতিনিধি। ওদিকে উত্তরের দাক্ষিণ্যের হস্ত হঠাৎ সঙ্কুচিত হয়ে এল। আটলান্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর চাপ এল: ডুবয় যতদিন তাঁদের শিক্ষক শ্রেণীতে থাকবেন, ততদিন কোনো কোনো ফাউণ্ডেশন থেকে আর কোনো

স্টাইপেন্ড গ্রান্ট মিলবে না। আটলান্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থের দিকে চেয়ে ডুবয় পদত্যাগ করলেন, পদত্যাগ করে নিউইয়র্কে এলেন।

সরকারী আনুকূল্যে বুকার ওয়াশিংটন ১৯১০ সালে ইংলণ্ডে গেলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রো সমাজের সুখী জীবনের মিথ্যা কাহিনী প্রচার করতে। ডঃ ডুবয়ের নেতৃত্বে নিগ্রো বুদ্ধিজীবীরা ইওরোপের জনসাধারণের উদ্দেশে রচিত এক বাণীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোর দুর্দশার কাহিনী বিবৃত করে উপসংহারে বলেন, "এই নীতির বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ, বলিষ্ঠ ও সাহসী আমেরিকানরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। মনুষ্যত্বের স্বীকৃতির দাবিতে তাঁদের এই ধর্মযুদ্ধে তাঁদের দরকার—বড় দরকার—ইংলণ্ড ও ইওরোপের নৈতিক সমর্থনটুকুর।...এ বড় কঠিন আঘাত, যখন দেখি, আমেরিকায় প্রতিদিন অপমান ও লাঞ্ছনা যার অভিজ্ঞতা, এমন একজন বাইরে গিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করে, এখানে সব ঠিক আছে।" কিন্তু এই বিবৃতির আগেই নিগ্রো বুদ্ধিজীবীরা মিলিত হতে শুরু করেছেন। ডঃ ডুবয়ের নেতৃত্বে ১৯০৫ সালে ক্যানাডার নায়াগারা ফল্‌স্‌-এ এঁদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা থেকে নায়াগারা মুভ্‌মেণ্ট নামে এক সংগঠনের জন্ম হয়। ১৯০৬ সালের সম্মেলনে হারপার্স ফেরিতে এঁরা এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেন: "...এই আধুনিক যুগে আগে কখনও এমন দেখা যায়নি যে, একটি মহান ও সুসভ্য জাতি তাদের নিজেদেরই দেশের মাটিতে লালিত নাগরিকদের প্রতি ব্যবহারে এমন কাপুরুষোচিত নীতি প্রয়োগ করে। বড় বড় ফাঁপা কথাগুলো বাদ দিয়ে তার নগ্ন কদর্যতাকে উপলব্ধি করলে দেখা যায়, এই নতুন মার্কিনী নীতি বলে: পাছে তারা শ্বেতাঙ্গদের সমান হয় ওঠে, তাই কালো মানুষগুলোকে মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টাটুকু পর্যন্ত করতে দিও না। আর এই দেশই দাবি করে যে, এরা নাকি যীশু খ্রীষ্টের অনুগামী। এই অধর্মের তুলনা কেবল এদেরই কাপুরুষতা।" দু' বছর এই মুভ্‌মেণ্টের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সমর্থনও ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। সাংবাদিক মেরী হোয়াইট ওভিংটন ১৯০৫-এর সভায় এসেছিলেন সংবাদপত্রের প্রতিনিধি-রূপে, ফিরে যান অনেক ভাবনা ও উৎসাহ নিয়ে। তিনি ফিরে গিয়ে শ্বেতাঙ্গ মহলে যোগাযোগ শুরু করেছিলেন। ইতিমধ্যে ১৯০৮ সালে ইলিনয়ার স্প্রিংফীল্ডে এক রক্তাক্ত দাঙ্গা হয়ে গেল বর্ণের প্রশ্নে। শ্বেতাঙ্গ সমাজের এক প্রগতিশীল অংশ অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে 'ন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশন

ফর দি অ্যাড্‌ভান্‌সমেণ্ট অফ কলর্ড্ পীপ্‌ল্' (এন্. এ. এ. সি. পি) গঠন করতে এগিয়ে আসেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন মেরী ওভিংটন ছাড়াও জেন অ্যাডাম্‌স্, উইলিয়ম ডীন হাওয়েল্‌স্, জন ডিউই, আর্থার স্পিঙ্গার্ন প্রমুখ। এঁদের আহ্বানে ডক্টর ডুবয় সহ নায়াগারা মুভমেণ্টের অধিকাংশ কর্মীই এন্. এ. এ, সি. পি-তে যোগ দেন। ১৯১০ সালে সরকারীভাবে এই সংগঠনের পত্তন হয়; ডুবয় হন এই সংগঠনের একমাত্র নিগ্রো কর্মকর্তা। এন্, এ. এ. সি. পি-র ঘোষিত লক্ষ্য ছিল: (১) বর্ণবিভেদী নীতির অবলুপ্তিসাধন, (২) শিক্ষার ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গের সমানাধিকার, (৩) নিগ্রোর ভোটাধিকার; (৪) যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের চতুর্দশ ও পঞ্চদশ সংশোধনীর প্রয়োগ।

এন্. এ. এ. সি. পি-র কর্মধারায় ডক্টর ডুবয়ের উপর দায়িত্ব পড়ে 'দি ক্রাইসিস্', নামে সংগঠনের মুখপত্র সম্পাদনার। এই কাজেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হয় কবি ও সমালোচক অধ্যাপক জে. ই. স্পিঙ্গার্নের সঙ্গে। বয়স, মেজাজ ও চিন্তাধারার সাদৃশ্যে তাঁরা খুব সহজেই বন্ধুত্বে বাঁধা পড়েন। তাঁদের কথাবার্তা চলত গভীরতম অন্তরঙ্গতায়। এন্. এ. এ. সি. পি-র শ্বেতাঙ্গ মধ্যবিত্তেরা ডুবয়ের জঙ্গী মনোভাবে প্রায়ই ভয় পেতেন, কিন্তু সম্পাদকীয় বোর্ডের সভাপতি স্পিঙ্গার্ন পাশেই ছিলেন; তাই 'ক্রাইসিস্'-এর সম্পাদকীয় কলমে ডুবয়ের স্বাধীনতা ছিল। এন্. এ. এ. সি. পি 'ক্রাইসিস'-এর আর্থিক দায়িত্ব নেন নি। কথা ছিল এইমাত্র যে, মাসিক ঘাটতি পঞ্চাশ ডলারের বেশি না হলে সংগঠন তা পূরণ করতে রাজী আছেন। ডুবয়ের পরিচালনা গুণে সংগঠনকে কখনই ঘাটতি পূরণ করতে হয়নি। ১৯১৬ সালের ১লা জানুয়ারি পর্যন্ত সংগঠন ডঃ ডুবয়ের ভাতা আর অফিস খরচের একাংশ বহন করেছিল। তারপর 'ক্রাইসিস্'-এর প্রচারসংখ্যা বাড়ে, 'ক্রাইসিস্' সম্পূর্ণ স্বয়ংনির্ভর হয়ে ওঠে। 'ক্রাইসিস্'-এর জনপ্রিয়তার প্রধান কারণই ছিল ডক্টর ডুবয়ের সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলির জনপ্রিয়তা। এই প্রবন্ধগুলির মাধ্যমে নিগ্রো সমাজকে রাজনৈতিক চেতনা দানের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তিনি বিশেষ বিশেষ প্রার্থীর প্রতি সমর্থন ঘোষণা করতে থাকেন।

১৯১১ সালে ডুবয় সমাজতন্ত্রী দলের সদস্যপদ গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর মনে হয় যে, এই দলের সদস্য থেকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অন্য দলের প্রার্থীকে সমর্থন জানানো পার্টির নীতি-বিরুদ্ধ। অথচ এ না করলে, তা হবে "নিগ্রো

সমাজের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। অন্তত আংশিকভাবেও তাদের ভোটের জোর যার পেছনে নেই এমন কোনো লোক হোয়াইট্ হাউসে যাবে, এ পরিস্থিতি তাদের পক্ষে বিপজ্জনক।" এই সংকটের তাড়নায় ডঃ ডুবয় সমাজতন্ত্রী দলের সদস্যপদে ইস্তফা দেন। রাজনৈতিক ভাবে নির্দলীয় যে ভূমিকা তিনি এই সময়ে গ্রহণ করেন, সেই ভূমিকাই তিনি প্রায় সারা জীবন বজায় রেখেছিলেন। ১৯৪৮ সালে এক প্রবন্ধে তিনি লেখেন: "আমার এই পঞ্চাশ বছরের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের দিকে তাকিয়ে আমি প্রথমেই দেখতে পাই যে এই কার্যকলাপ আমার চিন্তা ও কর্মে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অংশই গ্রহণ করেছে। নিগ্রো সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন এবং পৃথিবীর কাছে নিগ্রো সমাজের সত্যস্বরূপ উন্মোচনের যে-প্রয়াস আমার মূল প্রয়াস, এ সবকিছুই তারই অঙ্গমাত্র। অথচ এই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমার পুরনো দৃষ্টিকোণ বদলে গেছে। আমি আগে ভাবতাম যে, সামাজিক কর্মকাণ্ডের সমগ্রতা থেকে রাজনীতিকে একেবারে নির্বাসন দিতে হবে। এখন আমি যথার্থতর এক ধারণায় পৌঁছেছি যে, রাজনৈতিক জীবনের ভিত্তি অর্থনৈতিক, এবং তা হবেই।"

১৯১২ সালেই কিন্তু ডুবয় "বিপজ্জনক" বলে সরকারী মহলের ভয়ের কারণ হয়ে উঠেছেন। এই বছরই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন-প্রার্থী থিয়োডোর রুজভেল্ট জোয়েল স্পিঙ্গার্নকে সতর্ক করে দেন, "ঐ ডুবয় লোকটা" সম্পর্কে সাবধান থাকতে বলে দেন। প্রথম মহাযুদ্ধের শুরুতে স্পিঙ্গার্নের চেষ্টা সত্ত্বেও ডুবয়কে নিগ্রো সৈনিকদের সর্বাঙ্গীন তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়া সম্ভব হয় না—সরকারী বাধা ও সতর্কতাকে কিছুতেই নাড়া দেওয়া যায় না। স্পিঙ্গার্ন যুদ্ধে গেলেন, ডুবয় 'ক্রাইসিস্'-এর সম্পাদনা নিয়ে রয়ে গেলেন।

১৯০০ সালে মার্কিন সরকারের প্রদর্শনীর সঙ্গে ডুবয় প্যারিতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে লণ্ডনে গিয়ে তিনি এক প্যান্-আফ্রিকান সম্মেলনে যোগ দেন। ১৯১১ সালে লণ্ডনে সর্বজাতিবর্ণ কংগ্রেসে মার্কিন বিভাগের অন্যতম যুগ্ম সম্পাদকরূপে তিনি লণ্ডনের বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে দু-বার বক্তৃতা দেন। ১৯১৮ সালে রাষ্ট্রপতি উইলসন যখন ভার্সাই যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, ডুবয় তাঁকে এক চিঠিতে লেখেন: "আন্তর্জাতিক শান্তি কংগ্রেস জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে কি নেই, বিবেচনা করতে যাচ্ছেন। 'শাসিতদের সম্মতি' ও 'প্রতিনিধি মারফৎ দেশ শাসনের' নীতির

প্রবক্তা এক জাতির প্রতিনিধিরা সেখানে উপস্থিত থাকবেন। এই জাতি আমাদের জাতি। এই জাতির অন্তর্গত ১২০ লক্ষ মানুষের শাসিত হওয়ার ব্যাপারে কখনও কোনো সম্মতি প্রার্থনা করা হয় নি। যে সব রাজ্যে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে আইনপরিষদে তাঁদের কোনো সদস্য নেই, জাতীয় কংগ্রেসে তাঁদের একজনও প্রতিনিধি নেই।" এই বছর নিউইয়র্কে সিটি ক্লাবে এক ভোজসভায় ডুবয়ের পঞ্চাশতম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়! এন্. এ. এ. সি. পি.-র শাখা সমূহের পক্ষ থেকে তাঁকে একটি রৌপ্য কাপ উপহার দেওয়া হয়।

১৯১৯ সালে ডক্টর ডুবয়ের উদ্যোগে প্যারিতে প্রথম প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। পনেরোটি দেশের সাতান্ন জন প্রতিনিধি মিলিত হয়ে লীগ অব নেশন্‌স্-এর কাছে আফ্রিকান জনসাধারণের দিকে দৃষ্টি দেবার দাবি জানান। দু'বছর পর দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় আরো ব্যাপকরূপে। ১৯২৩ সালে লণ্ডন ও লিসবনে প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। ঘটনাক্রমে ডুবয় লাইবেরিয়ার রাষ্ট্রপতি কিং-এর শাসনভার গ্রহণের অনুষ্ঠানে মার্কিন সরকারী প্রতিনিধি হবার সুযোগ পেয়ে যান। ডুবয় ফিরে এসে রাষ্ট্রপতি কুলিজকে তাঁর অভিজ্ঞতার বিবরণী শোনান, আফ্রিকার উপকারার্থে বিভিন্ন পন্থা গ্রহণের পরামর্শ দেন—"তিনি খুব ধৈর্যের সঙ্গে শোনেন; আমি যা বললাম, তার কিছু বুঝেছিলেন কিনা, আমি অবশ্য নিশ্চিত নই। তিনি আমার পরামর্শের কিছুই গ্রহণ করেন নি।"

যুদ্ধান্তে দেখা গেল, এন্. এ. এ. সি. পি.-র সঙ্গে ডক্টর ডুবয়ের মতবিরোধ ক্রমশই বাড়ছে। স্পিঙ্গার্নও আর পুরোপুরি ডুবয়ের সঙ্গে নেই। ডুবয় ১৯২৮ সালে সোভিয়েত সফরে গেলেন, ফিরে এলেন এই গভীর বিশ্বাস নিয়ে যে, "সমাজতন্ত্রই প্রগতির একমাত্র পথ।" ১৯৩৪ সালে এন্. এ. এ. সি. পি. 'ক্রাইসিস' সম্পাদকের মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে উদ্যোগী হলে ডক্টর ডুবয় সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে আবার আটলান্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা-কর্মে ফিরে এলেন। ১৯৩৬ সালে তিনি দীর্ঘ সফরে আবার জর্মনি, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, জাপান ও হাওয়াই ঘুরে স্বদেশে ফেরেন। এদিকে ডুবয় লক্ষ্য করেছিলেন যে, নিগ্রো বুদ্ধিজীবী সমাজের বৃহদংশই শ্বেতাঙ্গ বিত্তশালী সমাজের শোষণ ও ব্যক্তিগত লাভের মৃগয়ায় সর্ব নীতি জলাঞ্জলি দিয়ে নিজেদের ঢেলে দিচ্ছেন। 'দ্য ক্রাইসিস'-এর পাতায় তিনি এ সম্পর্কে বহুবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। এবার আটলান্টা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে তিনি আরেক নতুন

পরিকল্পনা রচনা করেন—আটলান্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগ এবং ...টি নিগ্রো কলেজের যৌথ সমাজসমীক্ষা তথা কার্যত আত্মোপলব্ধির পরিকল্পনা। কিন্তু কর্তৃপক্ষের কুটিল রাজনীতিতে বয়ঃসীমার অজুহাতে ১৯৪৪ ...ডক্টর ডুবয়ের চাকরি গেল, তিনি আবার নিউ ইয়র্কে ফিরলেন এন্. এ. এ. সি. পি.-র বিশেষ গবেষণা বিভাগের প্রধানরূপে।

১৯৪৫ সালে মার্কিন প্রতিনিধিদলের অন্যতম উপদেষ্টারূপে ডক্টর ডুবয় ...সানফ্রান্সিস্কোয় জাতিসংঘে আসেন। তাঁর চেষ্টা ছিল, জাতিসংঘের ...আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদে ঔপনিবেশিক শাসনে জর্জরিত জনসাধারণের ...যুক্ত করা। ১৯৪৫ সালের ১৬ই মে তারিখে তিনি লেখেন: "এই ...গুলি সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট উল্লেখ না থাকার অর্থই এই যে, স্বাধীন রাষ্ট্রের ...নাগরিক নন বলেই এঁদের বাদ রেখে দেওয়া হল, এবং তাঁদের মুক্তি ও সুখ-...স্বচ্ছন্দ্যের প্রশ্ন তাঁদের মালিক দেশগুলির ইচ্ছামাফিক বিবেচিত হবে, সচেতন ...বিশ্ব-জনমতের দাবিতে নয়।" জন ফস্টার ডালেস্ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের ...উদাসীনতায় ডক্টর ডুবয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। ইংলণ্ডের ম্যাঞ্চেস্টারে এই ...বছর পঞ্চম প্যান্-আফ্রিকান কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়; সভাপতিত্ব করেন ডক্টর ডুবয়; প্রতিনিধিরূপে যোগ দিয়েছিলেন নক্রুমা, কেনিয়াট্টা প্রমুখ আফ্রিকান নেতৃবৃন্দ। লণ্ডনের স্কুল অফ্ একনমিক্‌স্-এ অতিথি লেক্‌চাররূপে তিনি অধ্যাপক ল্যাস্কির সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন।

১৯৪৪ সালে ডক্টর ডুবয় আরো সক্রিয় রাজনীতির দিকে এগোতে থাকেন। প্রোগ্রেসিভ পার্টি ও হেনরি ওয়ালেসের সঙ্গে তিনি কাজ করতে থাকেন। এই অপরাধে এবং উগ্রপন্থী হওয়ার অভিযোগে (অবশ্য পরোক্ষভাবে) এন্. এ. এ. সি. পি. থেকে তিনি বরখাস্ত হন ১৯৪৮ সালে। আরো কিছুদিন বিনা বেতনে তিনি প্রোগ্রেসিভ পার্টির সঙ্গে কাজ করে চলেন। মাঝে এমন অবস্থাও আসে ...: "মনে হল, আমি আর লেখাপড়া বোধ হয় চালাতে পারব না।" হেনরি ওয়ালেসের প্রগতিশীল ভাবধারা ত্যাগ ও বিশ্বাসঘাতকতায় আহত হয়ে ...এই পার্টি ত্যাগ করেন।

১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম শান্তি সমাবেশের অন্যতম ...উদ্যোক্তারূপে ডক্টর ডুবয় বিশ্ব শান্তি আন্দোলনে যোগ দেন। এপ্রিলে প্যারির বিশ্ব শান্তি কংগ্রেসেও ডক্টর ডুবয় মার্কিন প্রতিনিধিরূপে যোগ দেন। বিপুল ...বিপুল অভিনন্দনের মধ্যে ডক্টর ডুবয় এই কংগ্রেসে বলেন: "যে সব মতপার্থক্য

থেকে বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে, সমাজতন্ত্রের প্রসার বা কমিউনিজম্-এর সম্পূর্ণ সমাজতন্ত্রের প্রসার তার প্রকৃত কারণ নয়। সমাজতন্ত্র সারা পৃথিবীতে প্রসার লাভ করছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ব্যতিক্রম নয়।...সমাজতন্ত্রের এই প্রসারের বিরুদ্ধে যে একটি আধুনিক ব্যবস্থা লড়াই করে চলেছে, তার নাম ঔপনিবেশিকতাবাদ। এই ঔপনিবেশিকতাবাদ অতীতে যুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ থেকেছে, আজও আছে, চিরকাল থাকবেও।...আমার পিতা-পিতামহের শ্রম ও রক্তে গড়া আমার মাতৃভূমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ এই নতুন ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মহান্ দেশ, ঈশ্বরের কৃপায় সমৃদ্ধ, তার সাধারণতম নাগরিকদের কঠোর শ্রমে সমৃদ্ধতর।...মানুষের যে দাসত্ব একদিন আমাদের কাল হয়েছিল, শক্তির মদমত্ততায় সেই একই দাসত্বের ফাঁসে বেঁধে আমরা দুনিয়াকে নরকের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, সর্বনাশা এক তৃতীয় মহাযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।" জুলাই মাসে লাইনাস পাউলিঙ প্রমুখ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে ডক্টর ডুবয় অন্যতম আহ্বায়করূপে বিশ্বশান্তির জন্য মার্কিন মহাদেশের কংগ্রেস আহ্বান করেন। অগস্টে তিনি মস্কোয় নিখিল সোভিয়েত শান্তি সম্মেলনে যোগ দেন। ১৯৫০-এর এপ্রিলে তিনি প্যারিতে শান্তিকর্মীদের বিশ্ব কংগ্রেসে যোগ দেন। স্টক্হোম আবেদনে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানের সূত্রেই যে শান্তি-সংবাদ কেন্দ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গঠিত হয়, তার সভাপতি নির্বাচিত হন ডুবয়। ডুবয় পরে সবিনয়ে বলেন, "আমি সভাপতি হলাম এই সহজ কারণে যে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় আমি শিখেছিলাম, কোনো কমিটি বা একদল লোককে একত্র করে কাজ চালানোর নিয়মকানুনে জড়িয়ে না পড়ে কাজ সমাধা কী ভাবে করাতে হয়। আর আমার নাকি অভ্যাস ছিল যে, আমি সময়ে চলি, আর মধ্যরাত্রির আগে সভা মুলতুবী রাখতে জানি।" সাত মাস স্থায়ী ছিল এই শান্তি-সংবাদ কেন্দ্র। এর নেতৃত্বে ডুবয়ের সহকর্মী ছিলেন পল রোবসন, শার্লি গ্রাহাম, অ্যালবার্ট কান প্রমুখ। এই কেন্দ্র এই সাত মাসেই বিভিন্ন দেশে যুদ্ধপ্রস্তুতি ও শান্তি-আন্দোলনের খবরাখবর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচার করেন স্টকহোম্ আবেদন পুনর্মুদ্রণ করে আড়াই কোটি স্বাক্ষর সংগ্রহ করে।

ওদিকে ডক্টর ডুবয় তখন আরো একটি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। ১৯৪৮ সালে এন্. এ. এ. সি. পি. থেকে বরখাস্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কাউন্সিল অন

আফ্রিকান অ্যাফায়ার্সের আহ্বানে এই সংগঠনের অবৈতনিক সহ-সভাপতির ...পদ গ্রহণ করেন। বেতন না থাকলেও কাউন্সিল দায়িত্ব নিয়েছিলেন, ডক্টর ...র জন্য একটি অফিস ও একজন সেক্রেটারি যোগাবার। ঐ সুযোগটুকু ...ই ডক্টর ডুবয় কাজ করতে থাকেন। সংগঠনের অর্থবল কিন্তু নিতান্তই ...কিঞ্চিৎকর। ১৯৫০ সালে ডক্টর ডুবয় নিজেই বলেন যে, তাঁর অফিসের ভাড়া ও কেরানীর মাইনের ভার থেকে তিনি সংগঠনকে মুক্ত করতে চান। কর্মকর্তারা ...টী প্রস্তাব দিলেন, তাঁরা ১৯৫১ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি ডক্টর ডুবয়ের ...শীতম জন্মবার্ষিকী পালন করতে চান; এই উপলক্ষে সংগৃহীত তহবিল ...কে যা বাঁচানো যাবে, তাতে ডুবয়ের অফিসের খরচ বেশ কিছুকাল মেটানো ..., এবং তাঁর রচনাবলীর প্রকাশের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। 'বিরক্তি সত্ত্বে'ও ...নের মুখ চেয়ে ডক্টর ডুবয় রাজী হলেন। এই ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ ...লেন আইনস্টাইন, ল্যাংস্টন হিউজ, লায়ন ফিউখট্ওয়াঙ্গার, টমাস মান, ...লেন লক, ডক্টর ফ্রাংক্লিন ফ্রেজিয়ার প্রমুখ।

২৩শে ফেব্রুয়ারি জন্মোৎসব, আর ৯ই ফেব্রুয়ারি আরো একটি উপলক্ষ। ...গের বছর ডক্টর ডুবয়ের প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। ডক্টর ডুবয় বলেন, "আমার ...ন বড় একা লাগে, ছেলেবেলার এত বন্ধু মারা গেছে। আর আমার নিজের ...ী এক অযৌক্তিক সঙ্কোচের কারণে আমার কখনই বেশি অন্তরঙ্গ বন্ধু জোটে নি। কিন্তু এক তরুণী ছিলেন—সাহিত্যের ব্যাপারে আর জীবনের দুর্যোগে ...মি বহু বর্ষ তার ফাদার কনফেসর থেকেছি, বিশেষত পনেরো বছর আগে তার ...বার মৃত্যুর পরে। আমি তার কষ্টের কথা জানতাম, আমি তার সাফল্যে আনন্দ পেয়েছি। শার্লি গ্রাহাম তার সেই আশ্চর্য শহীদের মন নিয়ে নিজেকে ...রে বোঝাল যে তার সাহায্য ও সঙ্গ আমার দরকার; সত্যিই দরকার ছিল। আমরা তাই স্থির করলাম, আমার পরের জন্মদিনের দিন কয়েকের মধ্যেই আমরা বিবাহ করব।" ৯ই ফেব্রুয়ারি দিন স্থির ছিল; সেই বিবাহের যা-কিছু ... প্রস্তুতি, আংটি, বিবাহের লাইসেন্স ইত্যাদির কাজ সমাধা হল। ...রির রেস্তোরাঁয় ডক্টর ডুবয় ও শ্রীমতী গ্রাহাম একত্রে মধ্যাহ্ন ভোজ সারলেন (শ্রীমতী শার্লি গ্রাহাম বলেন: "ফরাসী রেস্তোরাঁ ডব্লু. ই. বি.-র সব সময়ই ...ন্দ। ওয়েটাররা তাঁকে ভালোবাসে, কারণ তিনি ফরাসী ভাষায় তাদের ...ঙ্গে পরামর্শ করেন, তাদের কথা মন দিয়ে শোনেন, তাদের সুপারিশ মেনে ...ন।") ডুবয় অফিসে চলে গেলেন। শ্রীমতী গ্রাহাম বাড়ি ফিরে এলেন।

রাত সাড়ে নটায় ডক্টর ডুবয়ের ফোন এল—শান্তি সংবাদ কেন্দ্র ও তার সভাপতি ডক্টর ডুবয়-এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে; অভিযোগ—কেন তাঁরা বিদেশী সংগঠনের দালাল বলে নিজেদের নাম রেজিস্ট্রি করান নি। মামলা মানেই হয়তো জেল। শ্রীমতী গ্রাহাম আবার ফোন করলেন, "আমাদের পুরনো পরিকল্পনা ভেঙে দিতে হবে। আমাদের এখনই বিয়ে করতে হবে।" শ্রীমতী গ্রাহাম লিখেছেন, "উনি জেলে গেলে একমাত্র স্ত্রীই সেখানে প্রবেশাধিকার পাবে। উনি জেলে থাকলে, একমাত্র স্ত্রীই ওঁর কথা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে। ওঁর পাশে দাঁড়াবার সুযোগ আমায় করে নিতেই হবে—আমার মনে হল, এটা অপরিহার্য।" ১৪ই ফেব্রুয়ারি তাঁদের বিবাহ হয়ে গেল—বিনা আড়ম্বরেই। পরের দিনই তাঁরা ওয়াশিংটন রওয়ানা হলেন। ১৬ই ফেব্রুয়ারি তাঁরা ওয়াশিংটনে কোর্টে হাজিরা দিলেন। প্রথমে শুনানীর দিন স্থির হল, তারপরেই ডুবয়ের হাতে হাতকড়া পরানো হল (পরে অবশ্য অ্যাটর্নির প্রতিবাদে এই হাতকড়া খুলে দিতে হয়), এক হাজার ডলারের জামিনে শেষে তিনি মুক্তি পেলেন।

জামিনে মুক্ত হয়ে এসেই ডক্টর ডুবয় এসে পড়লেন আরেক নতুন আন্দোলনের মধ্যে—তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহারের দাবীতে জাতীয় আন্দোলনে। ওদিকে ১৯শে ফেব্রুয়ারি খবর এল, যে হোটেলে ডুবয়ের জন্মোৎসবের ভোজসভার আয়োজন হয়েছিল, তার কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা বাতিল করে টাকা ফেরত দিচ্ছেন। উদ্যোক্তারাও কেউ কেউ পিছিয়ে গেলেন। তখন হার্লেমের বিখ্যাত স্মলস্ প্যারাডাইসে নতুন করে আয়োজন হল। এখানকার মালিক রাজী ছিলেন, এমন এক প্রয়াসে যে-কোনো ক্ষতি স্বীকার করে নিতে। ৭০০জন লোক চাঁদা দিয়ে এই সভায় যোগ দেন—৬,৫৫৭ ডলারের তহবিল ওঠে। ডক্টর ফ্রাংকলিন ফ্রেজিয়ার সভাপতিত্ব করেন। রোবসন ভাষণ দেন। বার্নাল, আইভর মন্টেগু, হিউলেট জনসন, জোলিও কুরী, এহ্রেনবুর্গ, ফাদেইয়েভ, তিখোনভ, শোশটাকোভিচ, লুকাক্স, নেন্নি, গাব্রিয়েল দ্য আরবুসিয়ে, আর্নল্ড্ ৎসোয়াইগ, মেরী ওভিংটন্, হিউবার্ট ডেলানি, ল্যাংস্টন হিউজ প্রমুখ বুদ্ধিজীবীদের অভিনন্দন পাঠ করে শোনানো হয়।

সারা দেশ ঘুরে ডুবয় দম্পতি জনমত গড়বার চেষ্টায় নামেন, অসংখ্য সভা সমাবেশে সরকারী অপচেষ্টাসমূহকে প্রতিহত করে তাঁদের বক্তব্য রাখতে থাকেন। মামলা লড়বার টাকা চাই, তাছাড়া, "আমরা উপলব্ধি করি যে

বিচার আইনের বিচার নয়, রাজনৈতিক নিপীড়ন; এর ফলাফল তাই ...উপরেই নির্ভর করবে।" দেশের মধ্যে প্রচার চলে, দেশের বাইরে ...পত্রাদি আসতে থাকে। ডক্টর ডুবয়ের সমর্থনে একটি আন্তর্জাতিক ...ও গঠিত হয়। ডক্টর ডুবয় ও তাঁর সহকর্মীদের পক্ষে মামলা পরিচালনার ...নেন আইনজীবী কুমারী গ্লোরিয়া অ্যাগ্রিন ও ভিটো মার্ক্যাণ্টোনিয়ো—...বিনা পারিশ্রমিকে। ডক্টর ডুবয়ের সপক্ষে "যা-কিছু করা সম্ভব" ...ইচ্ছা ঘোষণা করেন বিজ্ঞানী আইন্‌স্টাইন। দীর্ঘ বিচারের পর ...ভাবে নভেম্বর মাসে ডক্টর ডুবয় ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ নির্দোষ ঘোষিত হন। ...বছরের বৃদ্ধ উইলিয়ম এড্‌ওয়ার্ড ডুবয় এই দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা সহ্য করেও ...আন্দোলনের পথ ছাড়েন নি।

অভিজ্ঞতা ও অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে ডক্টর ডুবয় ক্রমেই তাঁর পুরনো রাজনৈতিক নির্দলীয় অভিযানের পথ ছেড়ে মার্কসবাদের কাছে সরে এসেছেন, ...কমিউনিস্ট পার্টির উপর চরম অগণতান্ত্রিক সরকারী নিষ্পেষণের ...১৯৫৯ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেন। পুরনো লেখা পড়লে বোঝা যায় যে, তাঁর ধারণা কী ভাবে বদলেছে, এবং প্রগতির পথ ...। ১৯৬০ সালে ঘানা সরকারের আমন্ত্রণে ঘানার জাতীয় তথ্যকোষ ...দায়িত্ব নিয়ে তিনি আক্রায় আসেন, ঘানার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশের স্বার্থে যাঁর জীবনব্যাপী আন্দোলন, সেই ক্লান্ত যোদ্ধাকে নবোত্থিত ঘানার সরকার যে সম্মান দেখিয়েছেন, তার তুলনা বিরল।

আক্রাতেই গত ২৭শে অগস্ট ডক্টর ডুবয়ের জীবনাবসান হল। সেই সংবাদ যখন আমেরিকায় পৌঁছয়, তখন ওয়াশিংটনের ২৮শে অগস্টের স্মরণীয় শোভাযাত্রার যাত্রা শুরু হচ্ছে। যাত্রার শুরুতে আড়াই লক্ষ শোভাযাত্রী তাঁর ...উদ্দেশে নীরবে দাঁড়িয়ে সম্মান জানায়। একের পর এক বক্তা তাঁর কাছে এই আন্দোলনের ঋণ স্বীকার করেন। নিগ্রো নাট্যকার ওসি ডেভিস সেই জনসমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বলেন, "এই আন্দোলন তাঁরই রচনা।"

রুদ্র সেনগুপ্ত

দ্বিজেন্দ্রলাল ও শেক্সপীয়র

এই উনিশশো তেষট্টি সাল জুড়ে বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় এবং অন্যত্র দ্বিজেন্দ্র শতবর্ষপূর্তি-উৎসব উদ্‌যাপিত হল। কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বাংলার এই কৃতী সন্তানের কাছে আমাদের ঋণ এখনো বহুলাংশে রয়ে গেছে। এ পর্যন্ত দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যকীর্তির যেটুকু মূল্যায়ন হয়েছে তা নিতান্তই সামান্য। ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত তাঁর এক সাম্প্রতিক প্রবন্ধে কবি এবং স্যাটায়ারিস্ট দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কে প্রশংসনীয় আলোচনা করেছেন। কিন্তু নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কে বিশেষ কোথাও উল্লেখযোগ্য আলোচনা চোখে পড়ে নি। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার পরিপূর্ণ আলোচনা নয়। আমাদের উদ্দেশ্য তাঁর নাটকের একটি বিশেষত্বের পর্যালোচনা। সেই বিশেষ দিকটি হল দ্বিজেন্দ্রলালের শেক্সপীয়র-মনস্কতা।

বাংলা নাটকে শেক্সপীয়রকে অনুসরণ করা হয়েছে প্রায় শুরু থেকেই। মধুসূদন, দীনবন্ধু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র প্রমুখ প্রাক্-দ্বিজেন্দ্র যুগের প্রত্যেক নাট্যকারের রচনাতেই শেক্সপীয়রের প্রভাব অল্পবিস্তর পরিলক্ষিত হয়। এঁদের প্রচেষ্টা এবং সাফল্যের কথা স্মরণ রেখেও নির্দ্বিধায় বলা যায় যে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকেই শেক্সপীয়রের প্রভাব সর্বাধিক সক্রিয় এবং ফলপ্রসূ।

শেক্সপীয়রের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের পরিচয় ছেলেবেলা থেকেই। শেক্সপীয়রের নাটক তিনি বারবার পড়তেন এবং "যে যে অংশ কাব্যাংশে শ্রেষ্ঠ বোধ হত, মুখস্ত করতেন।" ইংলণ্ডে যাওয়ার পর এই আকর্ষণ আরও গভীর হয়ে ওঠে। মহাকবির জন্মভূমিতে গিয়ে তাঁর সমাধি মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে তরুণ বাঙ্গালী কবি আবেগকম্পিত কণ্ঠে যা বলেছিলেন তাও এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য : "ঘুমাও কবিবর! যেখানে ইংরাজি ভাষা বিদিত সেখানে তোমার নাম অশ্রুত থাকিবে না।...দূরে গঙ্গাতীরবাসী আর্যাবর্তের শ্যামল সন্তান

তোমাকে ভারতীর বরপুত্র কালিদাসের প্রিয় ভ্রাতা, জগতের প্রিয় কবি বলিয়া আলিঙ্গন ও আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিবে।"[1] এই প্রতিশ্রুতি পালনের চিহ্ন দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যসাধনার সর্বস্তরে পরিস্ফুট। শেক্সপীয়রের সঙ্গে আবাল্যাবধি গড়ে ওঠা এই সুগভীর পরিচিতির ছাপ তাঁর নাটকে স্বপ্রকাশ। নাটকের ভাষা, ঘটনা-সংস্থাপনা, আংশিক বা সামগ্রিক চরিত্র-পরিকল্পনা, মায় ট্র্যাজেডি-পরিকল্পনাতেও মহাকবির প্রভাব সুস্পষ্ট।

দ্বিজেন্দ্রলাল নাটক লেখা শুরু করেন শেক্সপীয়রের অনুসরণে অমিত্রাক্ষর ছন্দে। 'তারাবাঈ' প্রকাশিত হবার পর নবীনচন্দ্র তাঁকে পরামর্শ দেন যে এই নতুন ধরনের অমিত্রাক্ষরে মাইকেলের ছন্দোমাধুরী নেই। সুতরাং গদ্যে নাটক রচনাই বিধেয়। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের "মাইকেল মধুসূদনের দৈববাণী মনে হইল—যে অমিত্রাক্ষর নাটক এখন চলিতে পারে না। তদুপরি নাটক অভিনয় করিবার জিনিস। সেই জন্য উক্তিগুলি যত স্বাভাবিক হয় ততই শ্রেয়। লোকে কথাবার্তা পদ্যে করে না, গদ্যে করে। এই সকল বিবেচনা করিয়া আমি তখন হইতে গদ্যে রচনা করিতে মনস্থ করিলাম।"[2] নিঃসন্দেহে অমিত্রাক্ষর সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের অভিযোগ ভিত্তিহীন। শেক্সপীয়র থেকে শুরু করে এলিয়টের কাব্যনাট্য তার প্রমাণ। আসল কথা দ্বিজেন্দ্রলালের অমিত্রাক্ষর নাটকের প্রয়োজন মেটাতে পারে নি। যাই হোক্ তিনি এখন থেকে গদ্যে নাটক লেখা শুরু করলেন। কিন্তু পরবর্তী নাটকসমূহের বহু স্থানে তাঁর গদ্য (যেমন 'সাজাহান' নাটকের ২য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্যে সাজাহানের স্বগতোক্তি) কাব্যাশ্রয়ী। এবং অমিত্রাক্ষরের ব্যর্থতা সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলালের গদ্যের এই কাব্যময়তার উৎস সম্ভবত শেক্সপীয়রের ভাষা নিয়ে তাঁর প্রথম দিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

ভাষার ব্যাপার ছাড়া বিভিন্ন ঘটনা-সংস্থাপনার ক্ষেত্রেও শেক্সপীয়রের কাছে দ্বিজেন্দ্রলাল ঋণী। 'ভীষ্ম' নাটকের শাল্ব-সত্যবতীর দৃশ্যটি (দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য) নিঃসন্দেহে 'রিচার্ড দি থার্ড' নাটকের প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্যের অনুসারে রচিত। 'তারাবাঈ' নাটকের সূর্যমল ও তমসার কাহিনী 'ম্যাকবেথ' নাটকের অনুসরণে পরিকল্পিত। ম্যাকবেথের ডানকানপ্রীতির মতো সূর্যমলের চরিত্রেও রয়েছে ভ্রাতুষ্পুত্রদের জন্য বাৎসল্য। আবার ম্যাকবেথের মতোই সূর্যমল রাজ্যলোভকে অস্বীকার করতে পারছে না। এই লোভকে উইচ্‌দের মতো চারণীর ভবিষ্যদ্বাণী প্রজ্বলিত করে তুলেছে। আবার সূর্যমল-পত্নী তমসা

যখন স্বামীর উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে কার্যকর করে তোলার প্ররোচনায় প্রয়াসী তখন আমাদের লেডি ম্যাকবেথের কথা মনে পড়ে যায়। 'নূরজাহান' নাটকের লায়লা চরিত্রের সঙ্গে 'হ্যামলেট' নাটকের নায়কের অবস্থাগত সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। পিতৃহন্তাকে যে তার মা বিবাহ করেছে হ্যামলেটের মতো লায়লার কাছেও তা অসহ। হ্যামলেটের মতোই সে তার মাকে সমালোচনা করেছে এবং পিতৃহন্তাকে ধ্বংস করার শপথ নিয়েছে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে পরবর্তী কালের লায়লা—যার নারীত্ব অন্যান্য সবকিছুর উপরে—হ্যামলেটের থেকে অনেক পৃথক এবং দুর্বল। আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। উপরোক্ত নাটকগুলি রচনাকালে দ্বিজেন্দ্র-নাট্যপ্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে নি। ফলত এদের সঙ্গে শেক্সপীয়রের নাটকগুলির সাদৃশ্য নিতান্তই অবস্থাগত এবং বহিরঙ্গ।

ভাষা বা ঘটনা-সংস্থাপনার থেকে দ্বিজেন্দ্র-নাটকের চরিত্রাবলী অধিকতর শেক্সপীয়র প্রভাবপুষ্ট। দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বাধিক প্রিয় লীয়ার চরিত্রের ছায়া তাঁর বহু চরিত্রেই লক্ষণীয়। 'মেবারপতন'-এর গোবিন্দসিংহ, 'সিংহল-বিজয়'-এর সিংহবাহু এবং 'পরপারে'-র বিশ্বেশ্বর প্রমুখ চরিত্রের সঙ্গে লীয়ারের অল্পবিস্তর সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। লীয়ারের পরেই দ্বিজেন্দ্রলালের ঋণ হ্যামলেটের কাছে। হ্যামলেটের প্রভাব লায়লার চরিত্র ছাড়া 'সিংহল-বিজয়' নাটকের কুবেণী চরিত্রের উপরেও পড়েছে। সূর্যমল, তমসা প্রভৃতি চরিত্রের উপর অন্যান্য শেক্সপীয়রীয় চরিত্রের প্রভাবের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। দ্বিজেন্দ্রলাল যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন সেখানেই শেক্সপীয়রের সাহায্য নিয়েছেন। প্রয়োজনবোধে সমধর্মী চরিত্রের মুখে শেক্সপীয়রের চরিত্রের সংলাপের প্রায় বঙ্গানুবাদ জুড়ে দিতেও ইতস্তত করেন নি। তাই 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে অপমানিতা মুরাকে যখন বলতে শুনি :

> "শূদ্রাণী! শূদ্র মানুষ নহে? তার কি ক্ষত্রিয়ের মত হস্তপদ নাই?
> মস্তিষ্ক নাই? হৃদয় নাই?"[৩]

তখন শাইলকের অনুরূপ সংলাপ :

> "I am a Jew. Hath not a Jew eyes? hath not a Jew hands, organs, dimensions, senses, affections, passions?"[৪]

সহজেই স্মরণে আসে।

চরিত্র পরিকল্পনার ব্যাপারে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা আংশিক ঋণের কথা ছেড়ে দিলেও দ্বিজেন্দ্রলাল-সৃষ্ট কয়েকটি প্রধান চরিত্র প্রায় আগাগোড়া শেক্সপীয়রের কয়েকটি বিখ্যাত চরিত্রের ছাঁচে ঢালা। 'সাজাহান' নাটকের দিলদার ও সম্রাট সাজাহান এবং 'নূরজাহান' নাটকের নূরজাহান পুরোপুরি শেক্সপীয়র-নির্ভর চরিত্র। দিলদার চরিত্রের সঙ্গে 'কিং লীয়ার'-এর ফুল-এর মিল বড় অল্প নয়। এমন কি কখনো কখনো দিলদারের সংলাপ শেক্সপীয়রের ভাষান্তর মাত্র। তবুও দ্বিজেন্দ্রলাল শেষরক্ষা করতে পারেন নি। "দিলদার চরিত্রটি ক্রমশই তার রহস্যময় দ্বৈত ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে—'কমিক' উপাদান ধীরে ধীরে শূন্যতায় মিলিয়ে গিয়ে একটি 'সিরিয়াস' চরিত্রেই পরিণত হয়েছে। রাজা লীয়রের 'ফুল' শেক্সপীয়রের অনবদ্য সৃষ্টি—দ্বিজেন্দ্রলাল…তার ছায়ায় দিলদারকে গড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু নাটকের মাঝখানেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছেন।"[৫] সাজাহান চরিত্রের পরিকল্পনা পুরোপুরি লীয়ারের চরিত্রানুগ। সাজাহানের অবস্থাগত মিল (সন্তানের কৃতঘ্নতা), নিদারুণ ট্র্যাজেডির সামনে নিষ্ক্রিয়তা, উন্মাদ হয়ে নিজের আক্রোশ ও অভিশাপ রুদ্র প্রকৃতির মধ্যে মিলিয়ে দেওয়া—এসবই লীয়ারের চরিত্রানুসরণে পরিকল্পিত। 'সাজাহান'-এর পঞ্চম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য তো 'কিং লীয়ার'-এর Storm scene-এরই ভাবানুবাদ! সাজাহানের নিষ্ফল চিৎকার—"ইচ্ছা কর্চ্ছে জাহানারা, যে এই রাত্রির ঝড় বৃষ্টি অন্ধকারের মাঝখান দিয়ে একবার ছুটে বেরোই। আর এই শাদা চুল ছিঁড়ে, এই বাতাসে উড়িয়ে এই বৃষ্টিতে ভাসিয়ে দিই।…মেঘ! বারবার কি নিষ্ফল গর্জ্জন কর্চ্ছ? তোমার আঘাতে পৃথিবীর বক্ষ খান খান করে দিতে পারো?" (৫।৩)—Storm scene-এ লীয়ারের আর্তির প্রতিধ্বনি। কিন্তু সাজাহান বা দিলদার চরিত্রের চেয়ে নূরজাহান চরিত্রে শেক্সপীয়রের প্রভাব অনেক বেশি সার্থক হয়েছে। শেক্সপীয়র যে ধাতুতে লেডি ম্যাকবেথকে গড়েছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল সেই ধাতুতেই নূরজাহানকে গড়েছেন। দু-জনেরই ট্র্যাজেডির বীজ চরিত্রের ভেতরে নিহিত, বাইরের ঘটনা থেকে সৃষ্ট নয়। নূরজাহানের শেষ অবস্থা sleep-walking scene-এর লেডি ম্যাকবেথকে স্মরণ করায়।

শেক্সপীয়রের কাছে দ্বিজেন্দ্রলালের ঋণ চরিত্র-পরিকল্পনার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। মহাকবির বহুবিধ নাটকীয় device দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর বিভিন্ন নাটকে অসংকোচে কাজে লাগিয়েছেন। 'সিংহল-বিজয়' নাটকে লীলার বালকের

ছদ্মবেশ ধারণ নিঃসন্দেহে শেক্সপীয়রীয় Sex-concealment device দ্বারা অনুপ্রাণিত। 'সাজাহান'-এর পঞ্চমাঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্যে ঔরংজীবের hallucination-এ —"দারার ছিন্ন শির", "সুজার রক্তাক্ত দেহ", "মোরাদের কবন্ধ"—ম্যাকবেথের ছায়াছবি বা ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মাদর্শন, কিংবা হ্যামলেটের প্রেতাত্মা-দর্শন দৃশ্যের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। সর্বোপরি সঙ্গীতের ব্যবহার বাংলা নাটকে নতুন না হলেও এর নাটকীয় সম্ভাবনাকে দ্বিজেন্দ্রলালের মতো এত সুন্দরভাবে কেউই কাজে লাগাতে পারেন নি। প্রাক্-দ্বিজেন্দ্র যুগের নাটকে প্রায়শই গানের একচেটিয়া মালিকানা ছিল 'বিবেকে'র বা 'নিয়তি'র বা এদের প্রতিরূপ। দ্বিজেন্দ্রলালই প্রথম গানকে সার্থকভাবে নাটকীয় করে তোলেন। তাঁর নাটকে গান সংলাপের কাজ করে, নিছক গানই থাকে না। এই ব্যাপারেও শেক্সপীয়র দ্বিজেন্দ্রলালকে প্রভাবিত করেছেন বললে তা নিছক কষ্টকল্পনা হবে না।

এতাবৎ দ্বিজেন্দ্র-নাটকের সঙ্গে শেক্সপীয়রীয় নাট্যরীতির যে সাদৃশ্য আমরা লক্ষ্য করেছি তা নিতান্তই বহিরাশ্রয়ী। দু-জনের মধ্যে প্রকৃত মিল উভয়ের ট্র্যাজেডির সমধর্মিতায়। দ্বিজেন্দ্রলাল নিজে বলেছেন, "অন্তর্দ্বন্দ্ব যে নাটকেই দেখানো হয়, তাহাই উচ্চ অঙ্গের নাটক। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সংঘাতে তরঙ্গ উঠাইতে না পারিলে বিপরীত বায়ুর সংঘাতে ঘূর্ণি ঝটিকা না উঠাইতে পারিলে কবি জমকালো রকম নাটকের সৃষ্টি করতে পারেন না।"[৬] এই অন্তর্দ্বন্দ্ব শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডির প্রাণবস্তুস্বরূপ এবং এই অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকেই দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর সার্থক নাটকের প্রকৃত শক্তি আহরণ করেছেন। তাঁর নাট্যসাধনার শুরু থেকেই এই বিশেষ গুণটি আয়ত্তে আনার প্রচেষ্টা আমরা লক্ষ্য করি। 'তারাবাঈ' নাটকে সূর্যমল-তমসার কাহিনী শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডির তারে বাঁধা। অবশ্য মাঝপথেই সূর্যমল চরিত্রটি অতি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তমসা অতি-নাটকীয়তার চোরাবালিতে হারিয়ে যায়। পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলালের শক্তি অনেক বেশি সংহত হয়ে ওঠে। এই সময় রচিত 'সাজাহান' নাটকে শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজিক রীতির প্রয়োগ সার্থকতর এবং অধিকতর শিল্পসম্মত। 'নূরজাহান' নাটকে ঘটে তাঁর শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ। এই নাটকের ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছেন, "নূরজাহান…নাটকে বাহিরের যুদ্ধ অপেক্ষা ভিতরের যুদ্ধ দেখাইতেই আমি আপনাকে সমধিক ব্যাপৃত রাখিয়াছি।" নিঃসন্দেহে 'নূরজাহান' নাটকটি এই প্রতিশ্রুতি পালনের স্বাক্ষর। যেভাবে আদিম প্রবৃত্তির ক্রিয়াচঞ্চল রূপ এখানে দেখানো হয়েছে এবং চরিত্রের ভেতর থেকে

ট্র্যাজেডিকে উৎসারিত করা হয়েছে তাতে নাটকটিকে নির্দ্বিধায় শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডির সমধর্মী বলে মেনে নেওয়া যায়। গতিবেগের তীব্রতা ও অনিবার্যতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি এবং ট্র্যাজেডি-পরিকল্পনায় 'নূরজাহান' বাংলাদেশের শেক্সপীয়রীয় নাট্যরীতির প্রথম সার্থক রূপায়ন।

দ্বিজেন্দ্রলাল মহাকবির থেকে অনেক নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর ঋণ শুধু অনুকরণমাত্র নয়। তাঁর সার্থক নাটকগুলি পড়ে কখনো একথা মনে হয় না যে যা দেখছি বা শুনছি তা অভারতীয়। শেক্সপীয়রের বিরাট প্রভাব সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে রেনেসাঁ জীবনদর্শনের সঙ্গে ভারতীয় জীবনদর্শনের সমন্বয় সাধিত হয়েছে। তাই 'সাজাহান' নাটকে নিদারুণ ট্র্যাজেডির মুখোমুখি দিলদারকে বলতে শুনি, "তবে এই বুঝি দয়াময়ের ইচ্ছা! বুঝতে পার্ছি না; কিন্তু বুঝি, এর একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে। নইলে এতখানি মিথ্যা এতখানি পাপ কি বৃথাই যাবে?" সাজাহানের ট্র্যাজেডি শেক্সপীয়রীয়: দিলদারের দার্শনিকতা ভারতের একান্ত নিজের। 'পরপারে' নাটকেও বিশ্বেশ্বর চরিত্র গড়ে উঠেছে লীয়ারের ছায়া অবলম্বনে, কিন্তু তার mysticism নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের প্রাচীনতম ঐতিহ্যসম্মত। দ্বিজেন্দ্রলালের শেক্সপীয়র-মনস্কতা কোনো মতেই শুধুমাত্র নকলনবিশী নয়। যাঁরা তাঁকে শেক্সপীয়রের বাঙ্গালী সংস্করণ ছাড়া আর কিছু মনে করতে রাজী নন তাঁরা অনুরূপ দৃষ্টান্ত থেকে বুঝবেন যে, দ্বিজেন্দ্রলালের দৃষ্টি সুদূর স্ট্র্যাটফোর্ডে থাকলেও তাঁর হৃদয়ের যোগ ছিল বাংলার মাটির সঙ্গে। এবং সেইখানেই তাঁর সবচেয়ে বড় গৌরব।

১। বিলাত-প্রবাসী [বিলাতের পত্র]; ১৬ নং চিঠি।

২। 'আমার নাট্যজীবনের আরম্ভ'—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

৩। চন্দ্রগুপ্ত—প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য।

৪। Merchant of Venice—তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য।

৫। দ্বিজেন্দ্রলাল: কবি ও নাট্যকার—ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায়।

৬। 'নাটকত্ব' (প্রবন্ধ পত্রিকায় পুনঃ প্রকাশিত)—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।



মিছিলের শহর

কলকাতায় নভশ্চরী, নভশ্চর

ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে তানিয়ার সঙ্গে আমার আলাপ হবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। ছোট্ট রুশী মেয়ে তানিয়া। হাতে একগাছা ফুলের এক সুন্দর তোড়া নিয়ে দাঁড়িয়েছিল এয়ারপোর্টে। হেমন্তের এক সকালবেলা। হিমেল হাওয়ার সঙ্গে জড়ানো সূর্যের আলো। তারিখটা হল নভেম্বরের একুশে, সাল উনিশশো তেষট্টি।

কিন্তু আলাপ হতেই হয়। কারণ, সে আর তার ভাই সের্গেই, তার বাবা মা আর তারই মতো আরো অনেকের সঙ্গে আমরা অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছি দমদম বিমানবন্দরে। আকাশের দিকে চোখ উঁচু করে তাকাচ্ছি, কখন সেই এক প্লেনের রূপালী ডানাটা দেখা যায়, যা একটু পরেই আকাশ থেকে নেমে এসে এই শহরের মাটি ছোঁবে, আর তা থেকে নেমে আসবে—কে? কারা?…

আর বলতে হল না, প্লেনের ঘড় ঘড় আওয়াজ কানে আসতেই তানিয়ারা তাদের দলবল নিয়ে এক ছুট দিল ট্যারম্যাকের দিকে, যেখানে

সেই রূপালী পাখিটা এসে নামবে। আর তর সইছে না। কতক্ষণে তার দরজা খুলে যাবে আর বেরিয়ে আসবে সেই তারা। যাদের জন্যে এত অপেক্ষা।

এত অপেক্ষা ছোট্ট তানিয়ার সঙ্গে আমাদের, সকলের, সারা শহরের। নিশ্চয়ই এতক্ষণে শহরের রাস্তার মোড়ে মোড়ে লোকজন সার দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। ফুল আর তোরণে সেজে মহানগরী অপেক্ষা করছে। অতিথিরা আসবে ঘরে। সেই অতিথি, মাটির মানুষ হয়েও আজ যাদের একমাত্র পরিচয় মহাকাশচারিণী, মহাকাশচারী।

"দোব্রী দেন": এ সম্ভাষণ এখন কলকাতার প্রায় অনেকেরই কণ্ঠস্থ হয়ে গেছে।

"দোব্রী দেন"। হাঁ, সেই প্লেনটা এখন দমদমের মাটি ছুঁয়ে দাঁড়িয়েছে। দরজা খুলে গেল। আর দেখা গেল একখানি হাসিভরা সরল মুখ, এয়ারপোর্টের জনতার দিকে ঘন ঘন হাত-নাড়া ইতিহাসের প্রথমা সেই নারী মহাকাশ-বিজয়িনীর গলা থেকে ভেসে আসা এক টুকরো সম্ভাষণ: "শুভদিন।" আর দেখি, তানিয়া আর তার ছোট্ট রুশী ছেলেমেয়েদের দল ছুটে গিয়ে ভালেন্তিনা তেরেসকোভার হাতে ফুলের তোড়া দিয়ে আসা। আগ্রহে তাদের ছোট্ট ছোট্ট চোখ-মুখগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, কলকাতা-প্রবাসী সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রতিনিধিদের এই ছেলেমেয়েদের। আমাদের অতিথি আর তাদেরই স্বজন মহাকাশবীরেরা এসেছেন এই শহরে। তাই সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত আর পশ্চিমবাংলার মন্ত্রী ও বিশিষ্ট অভ্যাগতজনদের ভীড় ঠেলে সবপ্রথম তাঁরাই পৌছান ক্যাপ্টেন ভালেন্তিনা তেরেসকোভা-নিকোলায়েভা, তাঁর স্বামী মেজর আন্দ্রিয়ান নিকোলায়েভ ও লেঃ কর্নেল ভালেরী বিকোভস্কী ও তাঁর সুন্দরী স্ত্রী শ্রীমতী বিকোভস্কায়ার কাছে। সেই মহাকাচারীত্রয়ীর করমর্দন সেরে ফিরে এল একমুখ খুশিতে ডগমগ হয়ে। তখন তানিয়ার ছোট্ট হাতটুকু ধরে আমিও তাকে না বলে পারলাম না: "খারোশ" (ভালো)। মিটমিটে চোখে চেয়ে মিষ্টি মিষ্টি হাসি আমাকেও সে উপহার দিয়ে যেতে ভুলল না।

তারপর শুরু হয়ে গেল এই মিছিলের শহরে পুরো দুটো দিন ধরে আনন্দ উত্তেজনা আর মহাকাশবীরদের নিয়ে সম্বর্ধনা আর জয়ধ্বনির পালা। এ উৎসব গর্বের, আনন্দের। ভারত সফরে মৈত্রীর জয়যাত্রায় তাঁরা বেরিয়েছেন,

এই সোভিয়েত মহাকাশবীরেরা। আমাদের গর্ব যে, এদেশই প্রথম পেল সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বাইরে পর পর পাঁচজন সোভিয়েত মহাকাশচারীকে সম্বর্ধনা জানাতে। আগে এই কলকাতাতেই আমরা পেয়েছিলাম বিশ্বের প্রথম মহাকাশচারী শ্রীয়ুরি গাগারিন-কে। তারপর তিতোফ এ দেশ ঘুরে গেছেন। এবার এলেন এঁরা তিনজন—আর বলাই বাহুল্য যে এবার মধ্যমণি হলেন বিশ্বের প্রথম মহাকাশচারিণী শ্রীমতী ভালেন্তিনা। তাঁকেই ঘিরেই এই ক-দিনের উৎসব-উদ্দীপনা যেন আবর্তিত হল। একজন মেয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম বহিরাকাশে পরিক্রমা করে এলেন, তাই সেই সোভিয়েত ভগিনীকে দেখার জন্য আমাদের মেয়েদের উত্তেজনাও যেন বাঁধ ভেঙেছিল।

তাই সবচেয়ে সুন্দর সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন মেয়েরা কলকাতায় ইতিহাসের বৃহত্তম নারী সমাবেশে ভালেন্তিনা, নিকোলায়েভ ও বিকোভস্কীকে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে। শুরুতেই যেমন "দোব্রী দেন" দিয়ে শুভদিনটির শুভযাত্রা শুরু হয়েছিল, চললও সারাদিন ধরে তাই-ই, তার পরের দিনটিও। উৎসব-সম্বর্ধনা আর উৎসব। লক্ষ লক্ষ মানুষ কাতারে কাতারে মহাকাশচারীত্রয়ের যাতায়াতের পথের ধারে ধারে দাঁড়িয়ে তাঁদের উদ্দেশে জয়ধ্বনি জানিয়েছেন, ফুল ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁদের দিকে। প্রথম যেদিনটিতে তাঁরা শহরে এলেন সেদিনটি থেকে তাঁদের চলে যাওয়ার দিনটি পর্যন্তও এই অবিরাম উদ্দীপনার অন্ত ছিল না। তাঁদের আসার দিনটির সেই একটি কথা মনে আছে। মহাকাশচারীদের নিয়ে মোটর-কনভয় দমদম বিমানঘাঁটি থেকে শহরের দিকে চলতে শুরু করেছে। যশোর রোডের উপর পড়ল অনেকগুলি স্বাগতম-তোরণ। কোনোটি বা পাড়ার মানুষদের, কোনোটি শ্রমিক ইউনিয়নগুলির, কোনোটি বা রক্তপতাকা-সাজানো কমিউনিস্ট পার্টির। তার সঙ্গে তেরঙা জাতীয় পতাকা উড়ছে পতপত করে। পথের ধারে ধারে কত অজস্র বর্ণ ছড়ানো-ছিটানো। নানা রঙের শাড়ি-জামা-পরা মেয়েরা আর স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা। যত লোক এই অভ্যর্থনা সারিতে দাঁড়িয়ে তার নিশ্চয়ই সত্তরভাগ ছিল মেয়েরা—বর্ষিয়সী গৃহিণী থেকে সমবয়সী মেয়ে আর ছোট ছেলেরা। তাই বলছিলাম তেরেসকোভা মেয়ে বলেই মেয়েদের টানটাই সবচেয়ে বেশি। তেরেসকোভা বিশ্বের প্রথম মহাকাশচারিণী, তাই নারীমুক্তিরও প্রতিকরূপিণী, সমাজতান্ত্রিক দেশের বিজয়িনী কন্যা।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে সেই দিনটির কথা। ছয় নং "ভোস্তক"-এ মহাকাশ প্যাড়ি দিয়ে নেমে আসার পর মস্কোর রেড স্কোয়ারে তেরেসকোভা, বিকোভস্কী আর সোভিয়েত মহাকাশবীরদের নিয়ে যে বিপুল সম্বর্ধনা হয়েছিল তার একটি বিবরণীর কথা। তখন তো ভালেন্তিনাকে দেখি নি। কিন্তু কলকাতায় তাঁরা আসতে সেই বিবরণীর সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখলাম। যে সংবাদপত্রে এ বিবরণী বেরিয়েছিল সেটি কিন্তু একটি পশ্চিমী কাগজ, বিলেতের 'অবজার্ভার'। তার মস্কোস্থ প্রতিনিধি তেরেসকোভা সম্পর্কে লিখেছিলেন: "রেড স্কোয়ারের সমাবেশে বিভিন্ন বক্তৃতা শোনার সময়ে তাঁর চুলগুলি বাতাসে অল্প অল্প উড়ছিল। সুন্দর গড়নের তাঁর মুখ যখন হাসিতে কোমল হয়ে উঠল, তখন তাঁকে সোভিয়েত নারীত্বের এক নিখুঁত প্রতিমূর্তি বলে মনে হয়েছিল।"

এ বর্ণনা বর্ণে বর্ণে সত্য, পশ্চিমী সাংবাদিকের চোখেও যা না পড়ে পারে নি। শুধু তো তেরেসকোভা নন, এই মহাকাশচারীত্রয়েরই রয়েছে সেই সোভিয়েত মুখাবয়ব। কারও মুখেই নেই সেই অতি-আত্মসচেতন কৃত্রিমতার লেশমাত্র যাতে কিনা মনে হয় তাঁরা এক একজন বীর, সাধারণ জনতা থেকে পৃথক আলাদা, একথা প্রমাণ করার জন্যেই যেন সব সহজ স্বাচ্ছন্দ্যকে চাপা দিতে হবে। তারুণ্যের পক্ষে স্বাভাবিক যে প্রাণোচ্ছলতা, তার সঙ্গে বিনয়ের সমন্বয় এবং যথার্থ বীর-চরিত্রের মূলভিত্তি যে সরলতা, এইগুলিই হল এই সব তরুণদের এবং এখন এই তরুণীটির খুব সুস্পষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এ হল সেই দেশের সব তরুণ-তরুণীদের মুখচ্ছবি যারা গঠন করছে কমিউনিজম নিজেদের মাতৃভূমিতে, সারা বিশ্বের জন্য সৃষ্টি করছে ভবিষ্যৎ, সেই সব মূল্যবোধ ও আদর্শই এই সব অনুপ্রাণিত মুখাবয়বের ছাঁদ তৈরি করে দিয়েছে যেন।

আমার কথা নয়, আরও একটু শোনাব খ্যাতনামা ইংরেজ ঔপন্যাসিক জেমস অ্যালড্রিজের কথা। তিনিও মস্কোয় সে সময় উপস্থিত ছিলেন। নতুন সমাজের এই নতুন মানুষদের চাক্ষুষ করে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন। আর ধরেছিলেন ঠিক তার তাৎপর্যের কথা। বিশেষ করে ভালেন্তিনার সাফল্য তাঁকে দিয়ে এই কটি লাইন লিখিয়েছিল: "ব্রহ্মাণ্ডলোকের এই সদ্য আবিষ্কৃত রোমাঞ্চকর জগতে নারীর ভূমিকার ক্ষেত্রে ভালেন্তিনা এই উপলব্ধিটা এনে দিয়েছেন যে, তিনি এমন একটা সমাজের অঙ্গ যে সমাজ

তাঁকে বাধা দেবার বদলে উৎসাহিতই করেছে। ধরে নিতে পারি যে রকেট, স্পুৎনিক আর ভোস্তোকগুলিকে যাঁরা মহাশূন্যে পাঠিয়েছেন সেই সব ইঞ্জিনিয়ার-কারিগর-বিশেষজ্ঞদের অর্ধাংশ হলেন নারী। সোভিয়েত জনসাধারণের কাছে এটা একটা খুব স্বাভাবিক হতে পারে কিন্তু আমাদের কাছে এতটা সহজ ও স্বাভাবিক ব্যাপার নয় এজন্য যে আমাদের দেশে নারী-ইঞ্জিনিয়ার বলতে গেলে নেই, নারী বৈমানিকের সংখ্যা খুব কম, নারী-প্যারাশুটবিদদের সংখ্যা আরও কম, কলা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পুরুষদের সমকক্ষ নারীর সংখ্যা যৎসামান্য। বলা বাহুল্য আমাদের নারীরা সোভিয়েত নারীদের মতোই বুদ্ধিমতী ও সুন্দরী এবং তাঁরাও তাঁদের মতোই স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু আমাদের সমাজব্যবস্থাটাই এমন যে"…ইত্যাদি। তাই অ্যালড্রিজকে একথাও স্পষ্ট করে লিখতে হয়: "মানুষের প্রত্যেকটি কর্মক্ষেত্রে সোভিয়েত ব্যবস্থা যে বিপ্লব ঘটাচ্ছে, তার প্রধান ও প্রাথমিক সূত্রই হল সমগ্র মানবসমাজের মুক্তি। সুতরাং নারীমুক্তি এর একটা অবিচ্ছেদ্য শর্ত। এই দিক থেকেই সাফল্যের গুরুত্ব এত বেশি। এই সাদাসিধে সোভিয়েত মেয়েটি শুধু যে বাস্তব কার্যক্ষেত্রেই নারীর যথার্থ সম-অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করার দিকেই আমাদের কয়েক পা এগিয়ে দিয়েছেন তাই নয়; যথার্থ বন্দীদশার ও অন্ধদশার শুরু ও শেষ যেখানে, পুরুষদের সেই মনের জেলখানার আরেকটি লৌহকপাটও তিনি ভেঙে দিয়েছেন।"

ইংরেজ ঔপন্যাসিক অ্যালড্রিজের এতখানি উদ্ধৃতি এই 'মিছিলের শহর' লিখতে গিয়ে দিতে হল এজন্যই যে,- বিশ্বের প্রথম মহাকাশচারিণী ভালেন্তিনাকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে আমাদের ঘরের মা-বোনেরা কেন এত উন্মাদনা বোধ করেছিলেন এবং কেনই বা কিছু রক্ষণশীল বন্ধু "এত হৈচৈ-এরই বা কি আছে এতে" বলে উঠেছিলেন, তারই একটা সদুত্তর দিতে। অনেকের থেকেই অ্যালড্রিজ যথেষ্ট গুছিয়ে তার যথার্থ তাৎপর্যটুকু ধরে দিতে পেরেছেন। এখন ফেরা যাক আগের কথায়।

নভেম্বর মাসের সেই দুই কিংবা আড়াইটা দিন, বিশ্বের মহাকাশচারিণীসহ সোভিয়েত মহাকাশচারীরা যতক্ষণ ছিলেন, এরকমই মেতে উঠেছিল আমাদের এই শহর। দুটো দিনই ঠাসা ছিল তাঁদের অনুষ্ঠানের পর অনুষ্ঠানে। শহরে উপস্থিত হয়েই তাঁদের প্রথম অনুষ্ঠানটি হল সাংবাদিকদের সঙ্গে, এক সাংবাদিক বৈঠকে। অজস্র প্রশ্নের তাঁরা অক্লান্ত উত্তর জুগিয়ে

যাচ্ছিলেন হাসিমুখে, একটুও ক্লান্ত না হয়ে। মুখর সাংবাদিকদের সে সব প্রশ্নের এক্তিয়ারে বাকি ছিল না কিছুই। সোভিয়েত মহাকাশযাত্রা ও মহাকাশযানের খুঁটিনাটি থেকে এমন কি নিকোলায়েভ-কে জিজ্ঞাসিত এরকম প্রশ্নও: "আপনাদের বিয়েতে কি ওদেশের বিজ্ঞানীরা ঘটকালি করেছিলেন?" উত্তরও শ্রীযুক্ত নিকোলায়েভ-এর মুখে মুখেই তৈরি: "না, আমাদের বিয়েটা ঠিক সেইভাবেই ঠিক হয়েছিল, আপনারও যেমন কাউকে পছন্দ হয়ে গেলে বিয়ের প্রস্তাব পাড়েন।" এ উত্তরে তারপর স্বভাবতই সকলকে হেসে ফেলতেই হয়। নববিবাহিতা শ্রীমতী তেরেসকোভাকেও সলজ্জভাবে, স্বামীর দিকে কটাক্ষ করে। আর, এমনি দেখেছিলাম সদাপরিহাসপ্রিয় সর্বদা হাসিমুখ শ্রীভালেরি বিকোভস্কীকে। মেয়েদের সম্বর্ধনায় গিয়ে অজস্র ফুলের পাপড়ি পড়ছিল গায়ে। তার খানিকটা মুঠো করে নিয়ে নিজেই ছড়িয়ে দিলেন স্ত্রী শ্রীমতী বিকোভস্কায়ার একরাশ সোনালী চুলভরা মাথায়। প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেও তারপর কিন্তু দেখেছিলাম স্বামীর দেওয়া গোলাপ ফুলের পাপড়ি সুন্দরী শ্রীমতী আরও সযত্নে চুলের মধ্যে গুঁজে গুঁজে রাখছেন মৃদু হেসে।

আরও মনে আছে, এত হাসি-উৎসব-আনন্দের স্রোতের মধ্যেও সোভিয়েত নভশ্চরী, নভশ্চরেরা ভোলেন নি যে তাঁরা মহাকাশজয়ী বীরদেরও জয়টিকা পরে এলেও আসলে এই পৃথিবীর শান্তির দূতিয়ালি করার দায় কাঁধে নিয়েই জয়যাত্রায় বেরিয়েছেন। এই প্রখর চেতনা তাঁদের অধিকতর প্রাণবন্ত, অধিক রমণীয় করেছে। ভালেন্তিনা ভোলেন নি তিনি সোভিয়েতের যৌথ খামারের একজন ট্রাক্টর চালকের সন্তান, ফ্যাসীবিরোধী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে দেশরক্ষার সংগ্রামে যাঁর পিতা প্রাণ দিয়েছেন। শ্রমিক-কৃষকের ঘরের সন্তান তাঁরা, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাই তাঁদের জীবনে, এবং এরকম প্রতিটি সোভিয়েত নাগরিকের জীবনে এনে দিয়েছে কর্ম ও বাস্তবের নবদিগন্ত। তেরেসকোভা তাই মেয়েদের সভাতেই বলেন এদেশের আর বিশ্বের সমস্ত মেয়েদের ডাক দিয়ে: দাঁড়ান আপনারা শান্তির সংগ্রামে। মহাকাশযানে চড়ে যখন এই পৃথিবীর চারপাশে আমি ঘুরে বেড়াই, আর দেখি আমাদের এই আশ্চর্য সুন্দর প্রিয়তম গ্রহটিকে, তখন মনে হয় সমস্ত মানুষকে ডাক দিয়ে চিৎকার করে উঠি,—বাঁচাও, এই সুন্দর পৃথিবীকে একটি পারমাণবিক যুদ্ধের বিপদের সর্বনাশ থেকে। একে রক্ষা কর।

ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী সমাবেশে তাই তিনি সেই গানই না গেয়ে পারেন না, মস্কোর বিশ্বনারী কংগ্রেসে যে শান্তির গানটি পৃথিবীর সর্বদেশের সর্বজাতির মেয়েরা গেয়েছিলেন। সে গানের বাণীতে বলা: "চিরকাল থাকুক সূর্যালোক, থাক আকাশ, চিরজীবী থাকুক বাবা-মা, চিরস্থায়ী হোক শান্তি।" শান্তির জন্ম মহাকাশ গবেষণায় ভারত যখন থুম্বা রকেটঘাটি থেকে প্রথম একটি আবহ-গবেষণা রকেট ছুঁড়ে সাফল্য অর্জন করে সেইদিনই কলকাতার নাগরিক সম্বর্ধনায় নিকোলায়েভ তাতে আনন্দ প্রকাশ করেন। বিকোভস্কির কথায় জানি যে, সম্প্রতি শুক্রগ্রহে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা যে তরঙ্গবার্তা পাঠিয়েছিলেন আর যা শুক্র থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে পৃথিবীতে ফিরে এসেছে, তাতে এই কটি শব্দই ছিল: "লেনিন-শান্তি-সোভিয়েত ইউনিয়ন"।

এমনি করেই নভেম্বরের ছুটি অবিস্মরণীয় দিনে আমরা আমাদের মধ্যে পেয়েছিলাম সোভিয়েতের মহাকাশ অতিথিদের, পেয়েছিলাম বিশ্বের প্রথম মহাকাশবিজয়িনীকে। ভালেন্তিনা তেরেসকোভার নিজের ভাষায় নিজের মহাকাশচারণ অভিজ্ঞতার বর্ণনা খানিকটা তুলে দিয়ে এ প্রসঙ্গ শেষ করব।

তার আগে একটি সাধারণ প্রশ্ন কয়েক মহল শোনায় সেটিও বলছি। কথা উঠেছিল 'মহাকাশ-পীড়া' নিয়ে। এরকম কিছু আছে নাকি? সমুদ্র ভ্রমণকালে যেমন 'সমুদ্র-পীড়া' ("সী-সিকনেস") হয়, কিংবা বিমানে চেপে অনেকের 'বিমান-পীড়া' হয়, তেমনি মহাকাশেও 'মহাকাশ-পীড়া' বা 'স্পেস-সিকনেস' হবার বিপদ আছে নাকি? অনেকে মনে করেন, যেহেতু পুরুষদের চেয়ে মেয়েরাই সমুদ্রপীড়া বা বিমানপীড়ায় বেশি ভোগেন, সেহেতু মহাকাশচারিণীদেরই এই মহাকাশপীড়ায় বেশি আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা। কিন্তু পরীক্ষাকালে এ মত ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে। দোলন-চেয়ারে, নাগরদোলায় আর ঘূর্ণায়মান কক্ষে অভ্যস্ত হতে হতে শেষ পর্যন্ত ভালেন্তিনাও এ-ব্যাপারে পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। বিশেষ করে শ্বাসনালীকে অতিরিক্ত চাপে অভ্যস্ত করে তোলার জন্যে ভালেন্তিনাকে প্যারাশুট-ঝাঁপ আর দীর্ঘকালব্যাপী ডুব-সাঁতারে অভ্যস্ত হবার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয়।

এবার ভালেন্তিনার নিজের কথা: "খোলাখুলিই বলি। মহাকাশচারীদের দলে যে দিন যোগ দিতে যাই সে দিন মনটা বেশ দমে গিয়েছিল। কি ভাবে তাঁরা আমায় গ্রহণ করবেন?

সত্যিকারের বিমান চালকরা এসে যোগ দিয়েছেন। জেট বিমানে ঘণ্টার

পর ঘণ্টা উড্ডয়নের রেকর্ড তাঁদের আছে। তাঁদের ভেতরে দুজন—গাগারিন ও তিতোফ বীরের সম্মান পেয়েছেন গোটা পৃথিবীতে। আর দু-জনও সমগ্র ট্রেনিং গ্রহণ করেছেন. তাঁদের কাছে কেন্দ্রাতিগ যন্ত্র, শব্দ-নিরোধী কক্ষ ও অন্যান্য ব্যবস্থা সহজ হয়ে এসেছে।

আমার আর কতটুকু জানা আছে? প্যারাশুটে ঝাঁপ দিয়েছি শুধু। ঐটুকুই আমার জানা। তাই মনে আশঙ্কা থাকা তো স্বাভাবিক। বাইরে যতই শান্ত থাকি না কেন, মনের চাঞ্চল্য ও আবেগ লুকিয়ে রাখা কঠিন। আমি জানতাম যে, কোনও বীরত্বপূর্ণ কাজ করতে হলে সর্বাগ্রে চাই একাগ্রচিত্তে নিরন্তর কাজ করে যাওয়া।...প্রথমত মহাকাশযানের কঠোর ও সুদীর্ঘ পথ সম্পর্কে সবকিছুর সঙ্গেই আমাদের পরিচিত করে দেওয়া হয়েছে। সবকিছুই আয়ত্ত করতে শেখানো হয়েছে। একদা য়ুরি গাগারিন ঠিকই বলেছিলেন, আমাদের উড্ডয়ন শুরু হয়েছিল এই পৃথিবীতেই। আমাদের এক ল্যাবরেটরি থেকে আর এক ল্যাবরেটরিতে যেতে হয়েছে। একটি ল্যাবরেটরিতে ছিল "চলন্ত পথ"—প্রশস্ত চলমান একটি ফিতা। এই ফিতার ওপর দাঁড়ালেই ফিতাটি প্রচণ্ড বেগে চলতে থাকে। ফিতার ওপর স্থির দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করলেই উল্টে যেতে হবে। তাই ফিতা যেদিকে চলছে তার উল্টো দিকে দৌড়তে হয়। রোটর যন্ত্রে আমাদের অদ্ভুত অভিজ্ঞতা জন্মেছে। একই সঙ্গে তিন সমতলে কেবিনটি ঘুরত। যে চেয়ারটায় বসতে হয়, সেই চেয়ার একটি অক্ষের চারদিকে ঘুরতে থাকে। যে ফ্রেমটার সঙ্গে কেবিন আঁটা সেই কেবিনটা ঘোরে অপর এক সমতলে এবং সমগ্র যন্ত্রটা ঘোরে তৃতীয় এক সমতলে। এতে এক অদ্ভুত জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই যন্ত্রে ট্রেনিং নেওয়া দেখলে পর্যন্ত আমাদের মাথা ঘুরত। তারপর আমাদের দেখানো হয়েছে তাপকক্ষ। এখানে বসে নানা জটিল কাজ করতে হয়েছে আমাদের। তারপর আমরা গিয়েছি কেন্দ্রাতিগ যন্ত্রে। পরিশেষে শব্দ-নিরোধক কক্ষে। বহির্জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এই কক্ষ। বিন্দুমাত্র কম্পন অনুভব করা যাবে না। এতটুকুও শব্দ শোনা যাবে না। ভাবী মহাকাশচারীদের সম্পূর্ণ একলা কাটাতে হবে এখানে। এই "নিস্তব্ধ কক্ষে" গেরমান তিতোফ পুশকিনের কবিতা আবৃত্তি করেছেন, পাভেল পপোভিচ গেয়েছেন ইউক্রানীয় গান, ভ্যালেরি বিকোভস্কী এঁকেছেন ছবি।"

এমনি করে ভালেন্তিনা শেষ পর্যন্ত পৌছান শেষ পর্যন্ত তার জীবনের শুভদিন, (ফের সেই "দোব্রী দেন" নয় কি?) ভোস্তক ৬-এ চড়ে পৃথিবী থেকে নক্ষত্রলোকে উধাও হওয়ার কাহিনীতে: "চাইকা! "চাইকা! জারিয়া ডাকছেন। য়ুরি গাগারিনের কণ্ঠস্বর। তিনি জিজ্ঞেস করছেন আমি কেমন অনুভব করছি। জবাব দিলাম—ভালো, সব ভালো। সেই কথাই বলেছিলাম। উত্তেজনা আর নেই, এখন প্রত্যাশা, অজানা অপূর্ব একটা কিছুর প্রত্যাশা।

পূর্ব স্মৃতির সময় এ নয়। পার্থিব ঘড়ির কাঁটা শেষে মিনিটের দিকে এগিয়ে চলেছে। মহাকাশযানের প্রধান নক্‌শাকার আমার সঙ্গে কথা বললেন। তারপর আবার য়ুরা। তাঁরা আমাকে উৎসাহ দিতে লাগলেন। আমার শুভ উড্ডয়ন কামনা করলেন। প্রিয় বন্ধুগণ! আপনাদের এই দরদ ও সহানুভূতির জন্য আমি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ। পার্টি ও দেশ আমার ওপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে তা পালনের জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। প্রস্তুত হবার মুহূর্ত ঘোষিত হল। টিক, টিক, টিক। মেট্রোনোমের সেকেণ্ডের কাঁটার শব্দ। না না, সে তো মেট্রোনোমের শব্দ নয়, আমার হৃদস্পন্দন। শেষ নির্দেশ।...মস্কোর সময় ১২টা ৩০ মিনিট। চলো!

যাত্রা শুরুর সঙ্গীতে কাদের সুর! শোনাচ্ছে সুদূরের বজ্র গর্জনের মতো। কেঁপে উঠল রকেটটা। বাড়তে লাগল শব্দ উচ্চ গ্রামে। অপ্রত্যাশিতভাবে চীৎকার করে উঠলাম উঠেছি, আমি উঠেছি। অতিভার বেড়ে চলল। একটি আঙুল নাড়ানও কঠিন। চমৎকার। এমনিই তো হবে। তার মানে সব ঠিক চলেছে। ঐ নক্ষত্রলোকে একাকী ছুটে চলেছে এক নক্ষত্রযান। তার চালক ভালেরি বিকোভস্কী। ভালেরি বললেন, প্রতীক্ষা করছি। পৃথিবীর সঙ্গে রেডিওতে যোগাযোগ কালে ভালেরি সংক্ষেপে এই কথা আমায় বলেছিলেন। টেলিভিশনের পর্দায় আমাদের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে ছিলেন।

একটু পরে গ্যাসের প্রবল শক্তি পৃথিবীর অভিকর্ষের বন্ধন কেটে দিল। অতিভার কমে গেল। গবাক্ষ পথে দেখতে পেলাম আমাদের গ্রহের চারিদিকে অবর্ণনীয় অপূর্ব আলোকচ্ছটা—রামধনুর মতো। ওগো! মহাবিশ্ব!"

ভালেন্তিনার নিজের কথা এই পর্যন্তই থাক। জয়তু সোভিয়েত নভশ্চরী, বিশ্বের প্রথমা নারী! তোমার আশ্চর্য সুন্দর অভিজ্ঞতায় আমাদের এই শহরবাসীকে অংশভাক করে নিয়ে গেলে। জয়তু সোভিয়েত নভশ্চর বীরেরা! তোমাদের বীরত্বে আমাদের এই সুন্দর বাসগ্রহ পৃথিবীতে চিরস্থায়ী শান্তি নেমে আসুক।

পুস্তক-পরিচয়

বিদ্রোহী ডিরোজিও। বিনয় ঘোষ। বাক্‌-সাহিত্য। পাঁচ টাকা।

ডিরোজিয়ো। চিত্তরঞ্জন ঘোষ। গ্রন্থ-নিলয়। ছ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

মাত্র বাইশ বছর আট মাস কয়েকদিনের আয়ুর পরিধিতে একটি তরুণ যুবক সমাজে যে আলোড়ন ও বিক্ষোভের ঝড় তুলেছিলেন, তা প্রথমে অবিশ্বাস্য ঠেকলেও হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও-র কর্মকাণ্ড আমাদের বিমূঢ় করবে সন্দেহ নেই। বাইশ বছরের মধ্যে মাত্র পাঁচ বছর সময় পেয়েছিলেন আপ্তবাক্য-বিশ্বাসহীন সুশিক্ষিত যুক্তিবাদী মানুষ সৃষ্টি করার, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন সকল প্রকার মতামতের অবাধ আলোচনা মানুষের অব্যক্ত প্রতিভা ও মানসিক শক্তির পূর্ণ বিকাশে সহায়ক। নিঃসন্দেহে এই বিশ্বাস ও তদ্‌অনুযায়ী কার্যসম্পাদন বিগত শতাব্দীতে বিপ্লবমূলক বলে বিবেচিত, বিশেষত উক্ত শতকের প্রথম-অর্ধে; যদিও রামমোহন রায় তখন প্রায় একাকী বিপ্লবীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন এবং স্বীয় লক্ষ্যে ভীষ্মের মতো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ডিরোজিও রামমোহনের মতো যুগন্ধর পুরুষ না হলেও স্বল্প সময়ে তিনি তরুণ দলের পুরোধা হয়ে আমাদের অনড় অচল সমাজে বিক্ষোভের কারণ হয়ে উঠলেন, তা ইতিহাসে কদাচিৎ দৃষ্ট, সেজন্য তিনি আমাদের অবশ্য স্মরণীয়, সেজন্য তিনি বিদ্রোহী ডিরোজিও।

বিনয় ঘোষ ডিরোজিও-র বিপ্লবী ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন বলেই তৎকালীন সমাজ-পরিবেশ ও ব্যক্তিজীবনের সাধারণ পরিচয়ের প্রেক্ষিতে ডিরোজিও-র বিদ্রোহাত্মক কর্মাবলীর নিদর্শন উপস্থাপিত করেন। বস্তুত কোনও ব্যক্তি স্বয়ম্ভু নন, ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ হয় পরিবার-পরিবেশ সমাজ-সভ্যতার জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ প্রভাবে, যদিচ এমন প্রভাবের সরল সমীকরণ অসতর্ক প্রয়োগ বিভ্রান্তির জন্ম দেয়। লেখক তাই অতি সতর্কে ডিরোজিও-র ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পটভূমি বিশ্লেষণ করে নিপুণভাবেই পরিবার অপেক্ষা সমাজ ও তৎকালীন সমাজে বিপ্লবের প্রস্ফুটিত অঙ্কুরের নানা সম্ভাবনার ইঙ্গিতের মধ্যে হেনরি লুই ভিভিয়ানের ভবিষ্যৎ ভূমিকার তাৎপর্য অনুসন্ধান করেন। যে-শিশুর যাত্রা শুরু হয়েছিল ডেভিড

ড্রামণ্ড-এর মতো "তরুণদের সার্থক শিক্ষকের" অধীনে, সে-শিশুই যৌবনে শিষ্য হিসাবে পেয়েছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, হরচন্দ্র ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী প্রমুখ কৃতবিদ্ সন্তানদের। বিনয়বাবু সেই শিশুর ক্রমবিকাশ ও পরিণতির বিকাশে তাই যথার্থভাবে সামাজিক পরিবেশের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন এবং সেই সূত্রে ডিরোজিও-র ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া দর্শাতে বিস্মৃত হন না। তাই আঠারো বছর বয়েসে লিখিত 'ক্রীতদাসের মুক্তি' কবিতায় মুক্তি ও স্বাধীনতার বার্তায় আগ্রহী ডিরোজিও-র ভাবজীবনের গভীর ইঙ্গিত প্রকাশিত হয়। তৎকালীন আকাশে বাতাসে দাসত্বের যে অবমাননা ও পীড়াকর অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল, তরুণ কবি, ভবিষ্যতের বিদ্রোহী বলেই, স্বাভাবিকভাবে আন্দোলিত হয়েছিলেন। অবশ্য এ-বোধ যদি তাঁর কাব্যকলায় নিঃশেষ হত, তবে বিদ্রোহী-কবি আখ্যায় ভূষিত হলেও তিনি সমাজ-শিরোমণিগণের শিরঃপীড়ার কারণ হতেন না। এই স্থলেই তিনি কথায় ও কর্মে আত্মীয়তা অর্জন করেছিলেন, সেজন্য তিনি বিদ্রোহী। বিনয়বাবু "ঝড়" পরিচ্ছেদে ডিরোজিও-র কর্মজীবনের শেষ অধ্যায় বর্ণনা করেছেন এবং তখনি আমরা ডিরোজিও-র ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হই যখন দেখি তাঁকে অপসারণের জন্য প্রায় ষড়যন্ত্র চলছে। বিনয়বাবু এই অধ্যায় অতি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন বিশেষ করে উইলসনের উত্তরে ডিরোজিও-র পত্রটি সম্পূর্ণ উদ্ধার করে। এতদ্ব্যতীত পরিশিষ্ট অংশ সংযোজনায় কবি ডিরোজিও, শিক্ষক ডিরোজিও সম্পর্কে তৎকালীন বিশিষ্ট সংবাদপত্র ও ব্যক্তিদের মতামত ডিরোজিও-র স্বরূপ বুঝতে যথেষ্ট সহায়ক হয়। বিনয়বাবু অতি সংক্ষেপে বিদ্রোহী ডিরোজিও-র চিত্র পরিবেশন করে পাঠকদের অকুণ্ঠ প্রশংসার পাত্র হবেন এ-বিষয়ে সমালোচক নিঃসন্দিগ্ধ।

চিত্তরঞ্জন ঘোষ বিদ্রোহী ডিরোজিও-র জীবনের শেষ কয়েকটি মাসের ঘটনা অবলম্বন করে তিন অঙ্কে 'ডিরোজিয়ো' নাটক রচনা করেছেন। ডিরোজিও-র শৈশবে বা কৈশোরে অথবা যৌবনের প্রারম্ভিক জীবনে নাটকীয় উপাদান আছে কিনা সন্দেহ, কিন্তু শেষ কয়েক মাস একটি তরুণের ঝড়-ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ জীবনে নাটকীয় তাৎপর্য অনুসন্ধান নিশ্চয়ই সার্থক, এবং চিত্তবাবু এই ক-মাস ঘটনা হিসাবে নির্বাচিত করে দক্ষ নাট্যকারের ক্ষমতারই পরিচয় দিয়েছেন। তিন অঙ্কে তিনটি বিশেষ দিনের মধ্যে ডিরোজিও-র যে চিত্র

অঙ্কিত করেন সেই চিত্রে, একদিকে বিদ্রোহী, অন্যদিক ট্র্যাজিক নায়ক মূর্ত হয়ে ওঠেন। প্রথম দৃশ্য শুরু হয়েছে ভগ্নী আমেলিয়ার সঙ্গে ডিরোজিও-র সংলাপে, নাটকের সমাপ্তি হয়েছে উভয়ের কথোপকথনে ও নায়কের মৃত্যুতে। প্রসঙ্গটি উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে তৎকালে ডিরোজিও-র ভগ্নী সংক্রান্ত কুৎসা যথেষ্ট রটনা করা হয়েছিল, তার তাৎপর্য কত গভীর ছিল তা আমরা জানতে পারি উইলসন সাহেবের পত্রে সামান্য উল্লেখে। চিত্তবাবু সেই কুৎসার মূলে কুঠারাঘাত করেন ভ্রাতা-ভগ্নীর মধুর সম্পর্ক চিত্রণে। অল্প দু-এক কথায় ও ইঙ্গিতে তিনি ডিরোজিও-র আপন কবিত্ব-সম্পর্কে অহমিকা, কোনো কোনো সময় অসহিষ্ণুতা অতি নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ওই স্বল্প পরিসরে আমরা সোফিয়া, ফ্রাংক-কে স্পষ্টরূপে চিহ্নিত করতে পারি, এমন কি তাঁর শিষ্যদের চরিত্রও অতি অল্প আয়াসে চিত্তবাবু উজ্জ্বল করে তুলেছেন। এই নাটক পাঠ করে আমরা ডিরোজিও-র কর্মকাণ্ডের সম্যক পরিচয় পাই, তবু নাটকটিতে ইংরেজি সংলাপের আধিক্য পীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। চিত্তবাবু এ-বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগী হলে দর্শকগণ খুশি হবেন সন্দেহ নেই, কারণ অত্যধিক ইংরেজি সংলাপের প্রয়োগে নাটকটির রস গ্রহণ অনেকের পক্ষে সহজ হবে না বলে মনে হয়, যদিও এ-নাটক অভিনীত হলে সাফল্য অর্জন করবে এমন ভবিষ্যদ্বাণী করা দুষ্কর নয়।

কুশল লাহিড়ী

অভিনব একাঙ্ক। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ। চার টাকা।

বাংলা ভাষায় একাঙ্ক নাটকের পুঁজি আজ খুব অল্প নয়। বেশ কয়েকজন গণনীয় লেখক আছেন, যাঁরা নিয়মিত ভাবে শুধু একাঙ্ক নাটকই লেখেন। নিয়মিত ভাবে একাঙ্ক নাটক মঞ্চস্থ করেন, এমন কতকগুলি শৌখিন নাট্য-প্রতিষ্ঠানও তৈরি হয়েছে দেশে। বলা বাহুল্য এ আশা ও আনন্দেরই কথা।

এই শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশকে কিন্তু অবস্থাটা এরকম ছিল না। তৃতীয় দশকের গোড়ায় মন্মথ রায় প্রথম নাট্যসাহিত্যের এই বিভাগটি যখন বাংলায় আমদানি করেন, তখনো বাঙালী পাঠক তার স্বাদে অভ্যস্ত হন নি। উক্ত দশকের শেষভাগে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, শিবরাম চক্রবর্তী এবং চতুর্থ দশকের শুরুতে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু ও বর্তমান

লেখক যখন একাঙ্ক রচনা করেন, তখনো অবস্থা একই চলেছে। যদি বা অধ্যয়নে তার আংশিক স্বীকৃতি হয়েছে, অভিনয়ে তার উপযোগীতা কেউ মেনে নিতে পারেন নি।

পঞ্চম দশকের মাঝামাঝিতে হঠাৎ নব্যনাট্য আন্দোলনের জোয়ার এল এবং তার ধাক্কায় আমাদের নাট্যরুচির বন্ধ্যা মৃত্তিকা নতুন ফসলে সমৃদ্ধ হতে লাগল। শৌখিন নাট্যালয় স্থাপিত হতে শুরু করল একের পর এক এবং তার চাহিদাতেই একাঙ্ক দ্ব-অঙ্ক নাটক লেখা শুরু হল পর্যাপ্ত সংখ্যায়। নাট্যকার, নট ও প্রয়োগশিল্পী তিন বিভাগেই দেখা দিলেন কুশলী প্রতিভাসম্পন্ন মানুষরা।

সেই আন্দোলনের সূচনা পর্বের একজন দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বলাই বাহুল্য প্রধান একজন। বহু পূর্ণায়তন নাটক লিখেছেন তিনি, লিখেছেন একাঙ্ক নাটকও এবং মঞ্চায়িত হয়ে তার বেশির ভাগই বাঙালী দর্শককে একসঙ্গে রসের পণ্য ও চিন্তার উপকরণ জুগিয়েছে। তিনি জীবন এবং সমাজকে যেমন চেনেন, তেমনি চেনেন রঙ্গমঞ্চকে। এ দুইয়ের সমাবেশ তাঁর নাট্যপ্রতিভায় হয়েছে মণিকাঞ্চন যোগের মতো।

কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তাঁর সমুদয় নাট্য রচনা নিয়ে চর্চার অবসর হবে না। এখানে আমি শুধু তাঁর 'অভিনব একাঙ্ক' নামে সম্প্রতি যে একাঙ্ক নাটকের সংগ্রহটি প্রকাশিত হয়েছে, তার কথাই বলব। এটি তাঁর আধুনিকতম রচনার সংগ্রহ তো বটেই, এক হিসাবে তাঁর বিশিষ্টতম একাঙ্ক নাটকাবলীরও সাক্ষাৎ মিলবে এতে। সুতরাং এই একটি বই পর্যালোচনা করলেই আমরা নাট্যকার দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়কে মোটামুটি চিনতে পারব।

আলোচ্য সংগ্রহে মোট আটটি ছোট-বড় একাঙ্ক নাটক সঙ্কলিত হয়েছে। এর মধ্যে তণ্ডুল যজ্ঞ হল রূপক নাট্য এবং চিড়িয়া বিদ্রোহ মুখোস নাট্য। বাকীগুলি সবই সমাজ-সমস্যামূলক। তার মধ্যে কোনোটায় সমস্যা প্রচ্ছন্ন, জীবনের দ্বন্দ্ব, মতের সঙ্গে মতের, আবেগের সঙ্গে আবেগের সজ্ঘাতই নিয়েছে প্রাধান্য। কোনোটায় বা জীবন রয়েছে পশ্চাৎপটে, সমস্যাটা এসেছে অগ্রবর্তী হয়ে। কিন্তু কোনোটাতেই আখ্যানবস্তু তার নাটকীয় গতিবেগ হারায় নি। অর্থাৎ নাটিকাগুলির কোনোটা সংসার লোকের ওপর করেছে আলোকপাত, কোনোটা খুলে দিয়েছে অন্তর্লোকের দুয়ার। আর এই দুই নিয়েই তো নাটক!

সংলাপে, সংবেদনশীল আবেগের স্পর্শে চরিত্রগুলি সবই তাঁর জীবন্ত। তবু কথোপকথনে তাদের মধ্যে আছে স্তরভেদ এবং এটাই উদ্ঘাটিত করে নাট্যকারের অভিজ্ঞতাপুষ্ট বৃহৎ জীবনবোধ। 'কেউ দায়ী নয়', 'অভিনেত্রীর আত্মা', 'অন্তস্তল'—এই তিনখানি একাঙ্ক যিনি মন দিয়ে পড়বেন, তিনি বুঝবেন, কত বিচিত্র মানুষের মিছিল সৃষ্টি করেছেন তিনি! কত বিচিত্র সূক্ষ্ম অনুভূতি এবং নিভৃত বেদনাকেই ভাষা দিয়েছেন, সেই সব মানুষের কথা, আচার ও উপলব্ধির ভেতর দিয়ে! এক ঝলকেই যেন দেশ, জাতি ও সমাজের অনুদ্ঘাটিত বিচিত্র দিক আত্মপ্রকাশ করে পাঠক ও দর্শকের চোখের সামনে। শুধু তাই নয়, নতুন প্রাণবন্ত সমাজের আশাও আবিষ্ট করে তার ভাবভূমিকে।

এই সংগ্রহের 'হারানো সুর' এবং 'দুইয়ের পিঠে এক—শূন্য' নাটক দুটি মঞ্চস্থ হলে নিঃসন্দেহে সর্বজন গ্রহণীয় হবে। বইয়ের ভূমিকাটি সুলিখিত ও মূল্যবান। সংগ্রহটির যোগ্য সমাদর কামনা করি।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

শহরতলির শয়তান। বারট্রাণ্ড রাসেল। অনুবাদ—অজিতকৃষ্ণ বসু। রূপা এ্যাণ্ড কোম্পানী চার টাকা পঞ্চাশ ন. প.।

'নিউ হোপস ফর এ চেঞ্জিং ওয়ার্ল্ড' বা 'দি ইমপ্যাক্ট অব্ সায়ান্স অন সোসাইটি' কিংবা 'হাজ ম্যান এ ফিউচার' প্রমাণ করে বার্ট্রাণ্ড রাসেল নিরপেক্ষ দার্শনিকতার তথাকথিত শুদ্ধতা ত্যাগ করেছেন। অর্থাৎ রিয়ালিজম্ বা নিও-রিয়ালিজম-এ বিশ্বাসী রাসেল তাঁর পীড়াদায়ক ইতিহাসবিমুখতা আর হয়তো পোষণ করেন না। বোধ করি, এই জীবনে নেমে আসার আবেগী ও শুদ্ধ টানেই সংশয়ী রাসেল গল্প লেখেন—যার প্রথম প্রকাশ উনিশ শো তিপ্পান্ন—বাংলায় অনুবাদ উনিশ শো বাষট্টিতে। যদিও রাসেল তাঁর দর্শন ও ধর্মনীতি, শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর মতের মধ্যে স্পষ্ট ভেদ টানতে ইচ্ছুক—তবুও স্পষ্টই বোঝা যায় রাসেলের ইচ্ছা সত্ত্বেও তা ঘটেনি—কারণ ঘটতে পারে না। তাই রাসেলের গল্পাবলীর পরিচিতির পূর্বে তাঁর দর্শন প্রসঙ্গে দু-এক কথা নেহাৎ অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

রাসেলের কাছে দর্শন ন্যায়-এর মধ্যেই সংকীর্ণভাবে সীমাবদ্ধ জ্ঞান নৈয়ায়িক সূত্রে ও প্রাথমিক সংবেদনে। ফলে যুক্তি বা রীজন-এর অবস্থিতি

অন্য বিশ্বে, আমাদের চেনা-জানা এই বিশ্বে নয়। অন্য বিশ্বের কারবার বিমূর্ত ন্যায় নিয়ে, আবেগ ইচ্ছামুক্ত এর শুদ্ধতায় বুদ্ধি আনন্দিত। স্বভাবতই এর ফলে দার্শনিকদের সঙ্গে এই জগৎ, জীবন ও মানবসমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, অন্তত রাসেলের চিন্তায়। এবং যে প্রজ্ঞাময় চিন্তা দার্শনিকরা মানুষকে দেন, তার জন্য আমাদের দ্বারস্থ হতে হবে চিন্তাশীল নয়, মূর্খদের ধ্যানধারণা বা নীতির কাছে, চিন্তা নয় মত্ত আবেগই হবে চালিকাশক্তি, আদর্শ নয় খেয়াল, নীতি নয় সুবিধাবাদই হবে আমাদের মূল সূত্র। এথিকস, মর‍্যাল প্রভৃতির থেকে যুক্তির নির্বাসন এই দর্শনের অন্যতম ফলশ্রুতি যার ফলে ভালো, খারাপ বোধ নেহাতই ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ।* কিন্তু এর ফল আরও মারাত্মক। বাস্তব জগতের অর্থ বা মূল্য নিরূপণে যুক্তির এই বন্ধ্যাত্ব কল্পনা নিঃসন্দেহেই দুঃখবাদী দর্শন। এর থেকেই পদার্থিক বিশ্ব ও মানুষের বিশ্বাস-সমৃদ্ধ ধ্যানধারণার মধ্যে অসেতুসম্ভব বিরোধে তাঁর বিশ্বাসের জন্ম। বাস্তব জগৎ "সর্বশক্তিমান বস্তু, ভালো-মন্দের প্রতি অন্ধ, মানবজীবন ও মানুষের আদর্শের প্রতি উদাসীন সুতরাং আন্তর মুক্তির উপায় আশার নির্বাসনে, প্রতিবাদহীন সহনশীলতায়, মানবিক মূল্যের প্রতি বীরত্বপূর্ণ কিন্তু হতাশাব্যঞ্জক আস্থায়।"

যদিও রাসেল জীবন-সম্পর্কিত তাঁর মতাবলীকে তাঁর দর্শন থেকে পৃথক করেন, তথাপি এরা যে পারস্পরিক সম্পর্কিত তা অনস্বীকার্য। বিজ্ঞান ও নৈতিকতার মধ্যে দ্বৈত বিরোধের আরোপ থেকেই রাসেল—প্রগতিতে বিশ্বাস বিজ্ঞানে নেই—এই সিদ্ধান্তে পৌছান, আমাদের ধ্যানধারণা ও জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও তাই, রাসেলের মতে, বিজ্ঞান নীরব। এবং মানবপ্রকৃতি সম্পর্কেও রাসেলের দৃষ্টিভঙ্গি দুঃখবাদীর। এই মানবপ্রকৃতির মধ্যেই নাকি যুদ্ধের বীজ নিহিত। এক্ষেত্রে পরিবেশ, সমাজ প্রভৃতি সবকিছুই রাসেলের কাছে অগ্রাহ্য। ফলত রাসেলের সমস্ত সংস্কারবাদী বা রিফর্মিস্ট লেখাতেই এই নৈরাশ্যের ছায়াপাত।

রাসেলের গল্প সংকলনের আলোচনাতে উপরিউক্ত মন্তব্যাবলী সর্বদা স্মরণীয়।

* মজার ব্যাপারটা এই যে, রাসেল তাঁর নিজের রচনাতেই যে নৈতিক মান নির্দিষ্ট করেন, তাঁর বিশ্বাস, তা সর্বজনীন ভাবেই প্রযোজ্য হওয়া উচিত এবং এগুলো, তাঁর মতেই, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ থেকে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

যদিও ভূমিকায় রাসেল জানিয়েছেন, "গল্পগুলো কোনো নীতি বা তত্ত্ব বোঝাতে চাইছে একথা কেউ ভাবলে আমি বড় দুঃখ পাব। প্রত্যেকটি গল্প তার নিজের খাতিরে নিছক গল্প হিসেবেই লেখা, পাঠক-পাঠিকাকে আনন্দ দিতে পারলেই তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ।" তথাপি জীবন ও সমাজসম্পর্কিত রাসেলের ভাবনার প্রকাশ এখানে অনেকটাই এবং এই গল্প পাঠে পাঠক-পাঠিকা যতটা আনন্দিত হন, তার থেকে বেশি চিন্তিত হয়ে পড়েন। অন্তত প্রথম তিনটি গল্পে দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেলের পরিচিত ছবিটিই দেখতে পাই—বিচলিত, হতাশ, অথচ সমাজের ব্যাধি সম্পর্কে তীব্র সজাগ, মুক্তির পথ সম্পর্কে দ্বিধান্বিত—দুঃখবাদী।

এই সংকলনের প্রথম গল্প "শহরতলীর শয়তান'। এই গল্পে ডাঃ মার্ডাক মালাকোর প্ররোচনায় কী ভাবে কয়েকটি জীবন বিড়ম্বিত হল তার কাহিনী বিবৃত হয়েছে। মালাকো তাঁর বাল্যজীবন ভুলতে পারেনি—"আমার মায়ের নিষ্ঠুরতা, প্রতিবেশীর হৃদয়হীনতা, ক্ষুধার যন্ত্রণা, বন্ধুহীন অবস্থা, নিরাশার ঘন অন্ধকার, এই সবই, আমার সৌভাগ্য শুরু হবার পরও সমগ্র জীবনকে আচ্ছন্ন করে রইল।" এর ফলে, তার মানবজাতির প্রতি ঘৃণা—"পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, একজনও নয়, যাকে আমি চরম যন্ত্রণা ভোগ করতে দেখতে না চাই।" এই ব্যক্তির প্ররোচনায়, কাজ করতে গিয়ে মিঃ প্র্যাবাবক্রম্বিব কারাবরণ, মিঃ বোশার আত্মহত্যা, মিঃ কার্টরাইট-এর প্রবাসে নির্বাসন, শ্রীমতী এলারকারের উন্মাদ হওয়া। এখানে স্মর্তব্য, উপরিউক্ত চারজনই, মালাকোর ভয়ঙ্কর প্রভাবে, তাঁদের স্বভাববিরুদ্ধ কাজে মেতেছিলেন। অর্থাৎ টাকা চুরি, নোংরা সাহিত্য প্রচারের ব্যবসা প্রভৃতি এই সব নিষ্কলঙ্ক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের প্রকৃতিতেই রয়ে গেছে—শুধু মালাকোর উৎসাহেই তার প্রকাশ ঘটেছে ও মালাকোর চক্রান্তেই তাদের পরিণতি ভয়াবহ। অথচ মালাকো এ সবের জন্য লাভবান হয় না কিছুই—সে কখনো নিজের জন্য কিছু করে না। শুধু ঘৃণা থেকে এর উৎপত্তি। কিন্তু সব থেকে তাৎপর্যপূর্ণ উত্তমপুরুষে যিনি গল্পটি বলেছেন তাঁর পরিণতি। তিনিও মালাকোর কবলে পড়েছিলেন—কিন্তু জটিল বৈজ্ঞানিক কাজে ডুবে গিয়ে তিনি আপাতত রক্ষা পেলেন। শ্রীমতী এলারকারের ঘটনাটিই তাঁকে বিচলিত করে তুলল—এবং "সমগ্র মানবজাতির প্রতি একটা ব্যাপক ঘৃণা আমার মনের ভেতর বেড়েই চলল।" মনে হল "ডাঃ মালাকোই দুনিয়ার

রাজা।”…“যারা নিতান্তই ভীরু স্বভাবের দরুণ সম্ভ্রান্ত জীবনযাপন করে তাদের অনেকের মনেই লুকিয়ে থাকে চমকদার পাপ করবার আশা, ক্ষমতার লোভ, ধ্বংস করার প্রবৃত্তি।” ফলত “আমার মনে হল মানুষ জাতটাই ভুল।” পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণা করে তিনি পেলেন মানবজীবনের সমাপ্তির ইঙ্গিত। কিন্তু ডাঃ মালাকোর কাছে গিয়ে তিনি বুঝলেন তাঁর উপায়ে ত্রুটি আছে; ডাঃ মালাকো তাঁকে কাজে লাগাতে চাইলেন। এবং তিনি ভাবলেন, “লোকটি পাপিষ্ঠ, সে বিষয়ে আমার বিশ্বাস ছিল গভীর। তিনি (মালাকো—লেখক) যখন পৃথিবী ধ্বংস করতে চান, তখন, আমার মনে হল পৃথিবী ধ্বংস করাটা পাপ।” তিনি গুলি করলেন ডাঃ মালাকোকে। কিন্তু এর পরও তিনি রেহাই পেলেন না—লুকিয়ে চোরের মতো হত্যা ও মালাকোর দুঃসহ চিন্তায়—তিনিও উন্মাদ হয়ে গেলেন। গল্পটির শেষ কথা, “বছরে একবার আমার দেখা হবে শ্রীমতী এলারকারের সঙ্গে, যাঁকে ভুলতে চেষ্টা করা আমার কখনোই উচিত হয় নি। আর, যখন আমাদের দেখা হবে, তখন দুজনে মিলে অবাক হয়ে ভাবব দুজনের বেশি প্রকৃতিস্থ লোক পৃথিবীতে কখনো থাকবে কিনা”। আলোচনার শুরুতে রাসেলের যে দর্শনচিন্তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তার ছায়া কি আমরা এখানে দেখতে পাই না?

পরের গল্প ‘কুমারী একস্-এর অগ্নি পরীক্ষাতে’ও এই একই মনোভঙ্গি। প্রাক্-কেলটিক্ অলংকরণ শিল্পবিদ প্রফেসর এন-এর সেক্রেটারী কুমারী একস কর্সিকা থেকে ঘুরে এসেই বিড়ম্বিত। সেখানে সে শুনেছে যে সেখানকার অধিবাসীদের মতে মানবজাতি একটা ভয়ংকর ব্যাধিতে ভুগছে, সেই ব্যাধিটি হচ্ছে সরকারী শাসন। এর বিনাশের উপায় শাসকদের বিলোপ সাধন। শুধু একুশটি রাষ্ট্রের একুশজন প্রধান শাসকের মৃত্যুই নয়, প্রফেসর এন-এর মৃত্যুও এরা চায়। কারণ প্রফেসর বলেছেন যে প্রাক্-কেলটিক অলংকরণ শিল্প ইওরোপে বিস্তার লাভ করেছে লিথুয়ানিয়া থেকে অথচ কর্সিকাবাসীদের মতে কর্সিকা থেকে। কুমারী একস্ ধরা পড়ে গিয়ে এই শেষোক্ত কার্য সম্পাদনের প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয়। ফলে তার মনে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়—“কোনটা বৃহত্তর পাপ—যে ভালো মানুষটিকে আমি শ্রদ্ধা করি তাঁকে হত্যা করা না সম্মান-বুদ্ধির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে শপথ ভঙ্গ করা?” কিন্তু এর সমাধান হয় প্রফেসর ও তাঁর সেক্রেটারীর যৌথ আত্মহত্যায়। আর যিনি গল্পটি বলেছেন তাঁর মনে হল “আমার জীবনধারণ বৃথা হয় নি, কারণ চোখের সামনে আমি

…টা মহৎ মৃত্যু দেখলাম।” সঙ্গে সঙ্গে তিনি কর্সিকাবাসীদের হাত থেকে “পৃথিবীর অপদার্থ শাসকগুলি”কে রক্ষার জন্য স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের দিকে গেলেন। …র আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে সংঘাত, কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায় না …তে পারা (বাস্তবিক কুমারী একস্-এর যে মানসিক দ্বন্দ্ব তা “নিরপেক্ষ শুদ্ধ” …র্শনিক রাসেলের লেখা বলেই সম্ভব হয়েছে), দুজন নির্দোষ ব্যক্তির মৃত্যু কিন্তু অপদার্থ শাসকদের বাঁচানোর প্রচেষ্টা—সব মিলিয়ে সেই নিষ্ঠুর …তামাশাত্মক চিত্রই উপস্থিত করে।

পরের গল্প ‘ইনফ্রা-রেডিওস্কোপ’ রূপকের ঢঙেই লেখা। বিশেষত যুক্ত …জাতিসংঘে বিভিন্ন প্রতিনিধির বক্তৃতা তো একটা চমৎকার চিত্র। চারজন ব্যক্তিতে মিলে ‘ইনফ্রা রেডিওস্কোপে’র মাধ্যমে কী ভাবে অর্থ উপার্জনের বিরাট ব্যবস্থা করে এবং সারা পৃথিবীতে নেহাতই অর্থ ও ক্ষমতাবলে এক বিরাট ধাপ্পাকে সত্য বলে চালায়—ফলত কি ভাবে ভয়ঙ্কর শত্রুর সামনে সব বিবাদী রাষ্ট্রগুলো একত্রিত হয় এবং যখন ধাপ্পা ধরা পড়ে তখন আবার যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়—এবং সেই সুযোগে আসল শত্রু মঙ্গলগ্রহীরা এসে মানবজাতিকে শেষ করে—এই কাহিনী প্রায় পুরোপুরিই রূপক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর একটি নিপুণ ছবি। এই গল্প সংকলনে এইটিই শ্রেষ্ঠ গল্প। তীক্ষ্ণ সচেতনতা ও চাপা ব্যঙ্গে গল্পটি যেমন চিন্তান্বিত করে, তেমনি উপভোগ্য। তবু এ গল্পেও সেই নিবিড় অন্ধকার—মানবজাতির শেষ সন্নিকটবর্তী। বাস্তবিক পারমাণবিক যুগে এসে কেউ কেউ ঈশ্বরকেই অবলম্বন করেছেন, আবার বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মতো তীক্ষ্ণ যুক্তিবাদীদের কাছে হতাশা ছাড়া কিছুই নেই। তবুও শান্তির জন্য আশাহীন হলেও বীরত্বপূর্ণ লড়াই করতে হবে, তাই বৃদ্ধ বয়সেও রাসেলের …শ্রী-নিরপেক্ষ মন হাত বাড়ায় শান্তির মানুষদের কাছে, নব উদ্দীপনায় …পৃথিবীতে শান্তি আনার শুদ্ধতম কর্মে রাসেল ভাস্বর হয়ে ওঠেন।

পরের গল্প দুটি ‘পার্নেসাস-এর রক্ষকবৃন্দ’ ও ‘পাত্রীর সুবিধা’ কম …চাভিলাষী। বিশেষত শেষের গল্পটি তো একটি মিষ্টি গল্প। প্রথম গল্পটিতে প্রফেসর গ্রেটোরেকস্-এর প্রতিশোধ নেয়ার স্পৃহায় কী ভাবে অধ্যক্ষ মিঃ ব্রাউনের জীবন বিষময় হয়ে গেল তার গল্প। এখানে লক্ষণীয়, মিঃ ব্রাউন-এর দুর্ভোগের মূলে কিন্তু এক মিথ্যা অপবাদ। এবং সে অপবাদ সত্য কিনা তা কেউ যাচিয়েও দেখতে ইচ্ছুক হয় নি। ‘পাত্রীর সুবিধা’য় …লিপ ধর্মযাজক-এর কন্যা পেনিলোপিকে কিভাবে নিজের পাত্রী পরিচয়

গোপন করে বিবাহ করে, ফলে উভয়ের মধ্যে ঝগড়া-বিচ্ছেদ ও পরে মিলন হয়—তার একটি মিষ্টি গল্প।

বাস্তবিক শেষের ছুটো, বিশেষত শেষেরটি বাদ দিলে, আর সব গল্পেই রাসেলের সংশয়ী মনের ছায়াপাত—আশ্চর্যের বিষয় রাসেল দুর্নীতি, দুরাচার প্রভৃতি সম্পর্কে সচেতন হয়েও এর থেকে মুক্তির উপায়ের কোনো পথই পান না। বোঝেন না ডাঃ মালাকো, ইনফ্রা রেডিওস্কোপ চক্রান্তকারীরা বা অপদার্থ শাসকবৃন্দ বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সমাজের থেকেই তাদের উৎপত্তি—সুতরাং সামাজিক পরিবেশ না পাল্টালে এই বিষবৃক্ষ নিশ্চিহ্ন করা যায় না। রাসেল একথা যেন বুঝেও বোঝেন না—নাকি দার্শনিক নিরপেক্ষতায় তিনি এ ব্যাপারে নীরবই থাকতে চান।

অবশ্যই গল্পের বিচার নিশ্চয়ই প্রাথমিকভাবে গল্প হিসাবে। সেই কারণে, রাসেলের গল্পেরও আলোচনাতে আমাদের দেখতে হবে গল্প হিসাবে গল্পগুলি কেমন হয়েছে। অবশ্যই গল্প হিসাবে এই সংকলন রাসেলের প্রথম প্রচেষ্টা। হয়তো সে কারণেই গল্পগুলি গল্প হিসাবে নিখুঁত হয় নি। প্রথমত, প্রায় গল্পই শিথিল হয়ে পড়েছে। ফলে, গল্পের প্রয়োজন ছাড়াও অনেক বর্ণনা, অনেক অংশ রয়ে গেছে। গল্পগুলো অযথা বিস্তৃতও হয়েছে। দ্বিতীয়ত, গল্পের পাত্রপাত্রীদের তিনি যে দ্বন্দ্বের মধ্যে নিয়ে গেছেন তার সমাধান যেমন আকস্মিক ও তেমনি সোজা। উপরন্তু, চরিত্রের পরিবর্তনও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত দ্রুত। তৃতীয়ত, গল্পগুলি মাঝে মাঝেই দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। ইনফ্রা রেডিওস্কোপের মতো চমৎকার গল্পেও প্রথম ও দ্বিতীয়াংশের রূপক মেলানো কঠিন। রাসেল-এর আসল লক্ষ্যও তাই দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছে। কিংবা হয়তো লক্ষ্যের দ্বৈত ভাব থেকেই এটা হয়েছে। অবশ্য এসব ত্রুটি এখানে বড় কথা নয়। কারণ রাসেল গল্প লিখেছেন এটাই বিস্ময়ের ব্যাপার।

সাটার্ন ইন্ দি সাবার্বস-এর অনুবাদকর্মে অজিতকৃষ্ণ বসু মুনশীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। প্রায় ক্ষেত্রেই তাঁর ভাষা সাবলীল ও ঝরঝরে—অনুবাদের আড়ষ্টতা প্রায় নেই। রাসেলের চমৎকার গদ্যের খানিকটা স্বাদও তিনি এনেছেন। তবে অনুবাদ নিখুঁত বলতে পারলেই সুখী হতাম। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে আক্ষরিক অনুবাদ করার ফলে, ভাষা জটিল হয়ে পড়েছে। যেমন কুমারী একস্-এর অগ্নি পরীক্ষায়: "শ্রীমতী মেনহেনেটের বন্ধু হিসাবে তিনি

অন্তরঙ্গ মহলে ঠাঁই পেয়েছিলেন, যাঁরা আইনের আওতার ভিতরে থেকেই হোক বা বাইরে থেকেই হোক, বাঁচিয়ে রেখেছিল স্বাধীনতার প্রাচীন ঐতিহ্য যা তাঁদের গিবেলাইন পূর্বপুরুষেরা নিয়ে এসেছিলেন উত্তর ইতালীর তখনো প্রাণবন্ত গণতন্ত্রগুলি থেকে। যারা শুধু পাহাড়, মেষপালকদের কুটির আর কয়েকটা ছোটখাট গাছ ছাড়া আর কিছুই দেখেন নি, সেই ধরনের পর্যটকদের দৃষ্টির অগোচর পার্বত্য গোপন এলাকাগুলোতে তাঁর অবাধ গতি ছিল মধ্যযুগীয় জাঁকজমকে ভরা একাধিক পুরনো প্রাসাদে, যার ভেতর দেখতে পাওয়া যেত প্রাচীন গণফ্যালনিয়াকদের কর্ম এবং বিশ্ববিখ্যাত কণ্ডটিয়ারদের মণিমাণিক্য-খচিত তরবারি।" কিংবা On the morning after my return I presented myself at the house of professor N. I found him sunk in bloom, decorative art forgotten, and Miss X. absent এই অংশের অনুবাদে andটিকে যখন অনুবাদক উপেক্ষা করেন তখনও অনুবাদের বাক্যটিও ঝুলে পড়ে। কদাচিৎ হলেও, অনুবাদের উন্নতিরও অবকাশ রয়েছে। অবশ্যই এসব ছোটখাট ত্রুটি। এবং আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে এগুলো সংশোধিত হবে।

জানি না, এই গল্পগুলি বার্ট্রাণ্ড রাসেল এখন লিখলে—এই দশ বছর পরে—কি লিখতেন। বিশেষত কিউবার সংকটের পর তাঁর মনোভঙ্গি কী একরকম ভাবেই প্রতিফলিত হবে? তিনি কি এখনও ভাবেন, "The world was moving more and more in the direction of war and dictatorship, I saw nothing useful that I could do in practical matters." অন্তত তাঁর শান্তির সপক্ষে ঐতিহাসিক সংগ্রাম থেকে সে কথা মনে হয় না। এই শান্তির জন্য সংগ্রাম রাসেলের প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে—এমন কি এই শান্তির জন্যই হয়তো তিনি দুর্নিবার ভ্রান্ত পথে রাশিয়াকে শেষ করে দিতে বলেছিলেন; এখন তাঁর দৃষ্টি আরও স্বচ্ছ—আরও ইতিহাস-চেতনা সমৃদ্ধ। তীক্ষ্ণ যুক্তির পথ বেয়েই রাসেলের আত্মিক উত্তরণ এই শান্তির জন্য সংঘবদ্ধ সংগ্রামে, পারমাণবিক যুদ্ধকে ঠেকিয়ে রাখার অকুণ্ঠ প্রয়াসে—বুঝি বা তাঁর দার্শনিক নিরপেক্ষতাও তিনি ত্যাগ করবেন। এই প্রচণ্ড মানবিকতায় হয়তো, কলিংউড যেমন বলেছেন, রাসেলও বুঝেছেন: "..the minute philosophers of my youth, for all their profession of a purely scientific detachment from practical affairs were the propagandists of a coming Fascism."

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

বি জ্ঞা ন প্র স ঙ্গ

মহাকাশ-জয়ের দিকে আর এক পা

আজ থেকে মাত্র ছয় বছর আগে প্রথম মনুষ্যনির্মিত উপগ্রহটি মহাশূন্যে পৃথিবীর কক্ষে স্থাপিত হয়। কিন্তু মহাকাশ অভিযানের ইতিহাস এত বিচিত্র যে যত রকমের মহাকাশযান এ পর্যন্ত পৃথিবীর কক্ষে স্থাপিত হয়েছে, সেগুলির মাত্র একটি বর্ণনামূলক তালিকা দিতে গেলেই তালিকা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। তাই, মহাকাশ-জয়ের পথে কতকগুলি খুব বড় রকমের পদক্ষেপ হিসেবে কয়েকটি মহাকাশযানের নাম করা যেতে পারে। এগুলির মধ্যে অধিকাংশই হল সোভিয়েত সাফল্যের সূচক: "স্পুৎনিক—১", "ল্যুনিক—১", "ভোস্তোক—১", "কস্‌মস্—১" সোভিয়েত মহাকাশ-কার্যসূচীর কতকগুলি অতি উজ্জ্বল পর্যায়ক্রমিক সাফল্যের প্রথম অগ্রদূত।

১লা নভেম্বর, ১৯৬৩, তারিখে এই তালিকায় আরেকটি নাম যুক্ত হল—"পলিয়ট—১"। পৃথিবীর কক্ষপথে পরিক্রমারত অবস্থায় এই মহাকাশযানটির ইচ্ছামত দিক পরিবর্তন করা যাবে। মহাকাশ অভিযানের ক্ষেত্রে এটা একটা খুব বড় রকমের দিকচিহ্নকে সূচিত করছে।

পৃথিবীর নিকটতর শূন্যলোকে ডাইনে-বাঁয়ে ওপরে-নিচে ইচ্ছামত চারদিক পরিবর্তন করা যায় এমন একটা মহাকাশযানের গুরুত্ব সম্পর্কে খুব বেশি বুঝিয়ে বলা বাহুল্য। গ্রহান্তর-যাত্রার প্রস্তুতিপর্বে যে আন্তর্গ্রহ স্টেশন স্থাপন করা দরকার, তার জন্যে পলিয়ট শ্রেণীর মহাকাশযান অবশ্য প্রয়োজনীয়।

কৃত্রিম উপগ্রহকে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করার জন্যে উৎক্ষেপণ-বেগ সঞ্চার করা দরকার; কিন্তু কক্ষে স্থাপিত হওয়ার পর তার ঘূর্ণন-পথ অপরিবর্তনীয় থাকে—একটা বৃত্ত বা উপবৃত্ত ধরে তা পৃথিবী পরিক্রমা করে এই নির্দিষ্ট কক্ষপথের বাইরে তার পক্ষে চলে আসা সম্ভব নয়। কিন্তু এটা একটা মস্ত বড় সীমাবদ্ধতা। স্পুৎনিকগুলিকে ক্রমেই এমন সব কাজের দায়িত্ব দিয়ে মহাশূন্যে পাঠানো হচ্ছে যার দরুন তার ইচ্ছামত দিক পরিবর্তন না করলে চলবে না। যেমন, পৃথিবীকে ঘিরে কতকগুলি বিকিরণ বলয় ও বিপজ্জনক এলাকা রয়েছে। গ্রহান্তরযাত্রীকে সেই সব এলাকাগুলিকে এড়িয়ে

পার হয়ে যেতে হবে। তাছাড়া, উল্কার সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াবার জন্যেও মহাকাশযানের দিক পরিবর্তন করা দরকার।

কৃত্রিম উপগ্রহগুলির বাস্তব প্রয়োগের একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক হল আবহাওয়া অনুশীলন। বিশেষ করে, হারিকেন বা ঝঞ্ঝাবাত্যার গতিপথ পৃথিবীস্থিত স্টেশনগুলিকে জানিয়ে দেওয়ার জন্যে আবহাওয়া-উপগ্রহের পক্ষে সেই ঝঞ্ঝাবাত্যার দিক পরিবর্তনকে অনুসরণ করা প্রয়োজন। কৃত্রিম উপগ্রহগুলির অন্যান্য প্রয়োগের মধ্যে রয়েছে—পৃথিবীর সঠিক আকার ও পৃষ্ঠদেশ অনুশীলন, পৃথিবীর অভ্যন্তরে বস্তুর পরিবেশন, পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র ও অন্যান্য ভূ-ভৌতিক গবেষণা সংক্রান্ত অনুসন্ধান চালানো। এ সবের জন্যেও কৃত্রিম উপগ্রহগুলির কক্ষ পরিবর্তনে সমর্থ হওয়া প্রয়োজন।

দিকপরিবর্তন কি করে

মহাকাশযান কি করে দিক পরিবর্তন করে? এর জন্যে একাধিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব। যেমন, কতকগুলি বাড়তি জেট ইঞ্জিন তার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া যেতে পারে—যে ইঞ্জিনগুলিকে ইচ্ছামত কতকগুলি বিশেষ কোণে নির্ধারণ করে চালালে মহাকাশযানটি তার বিপরীত দিকে গতিশীল হবে। আরেকটি উপায়েও তা করা যেতে পারে: সূর্যরশ্মির চাপ বা প্রেশারকে এ ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যেতে পারে। পৃথিবীর নিকটতর মহাশূন্যে প্রতিফলন-সক্ষম কোনো বস্তুর ওপরে এই সূর্যরশ্মির চাপ হল প্রতি বর্গমিটারে প্রায় ০·৯ মিলিগ্রাম। বলা বাহুল্য, এই চাপ এতই অকিঞ্চিৎকর যে পৃথিবীর আকর্ষণের অধীন কোনো মহাকাশযানকে তা সরাতে পারে না। কিন্তু পার্থিব আকর্ষণক্ষেত্রের বাইরে মহাশূন্যদেশে মহাকাশযানের দিক পরিবর্তনে এটুকু বল বা ফোর্সকেও কাজে লাগানো যেতে পারে। এর জন্যে বাতাসের জোরে নৌকা চালাবার সময়ে যেমন পাল তোলা হয়ে থাকে, তেমনি কতকগুলি আয়না-ফলক এই মহাকাশযানের সঙ্গে যুক্ত থাকবে তার 'পাল' হিসেবে। বাতাসের গতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নৌকার পালকে যেমন দরকারমতো ঘুরিয়ে দেওয়া হয়, মহাকাশযানের ওই আয়না-ফলকের 'পাল'গুলিও তেমনি সব সময় স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় এমনভাবে ঘুরতে থাকবে যাতে কিনা সূর্যরশ্মিগুলো সর্বদা সেগুলির ওপরে লম্বভাবে এসে পড়বে। তাছাড়া, মহাকাশযানের চালক ভেতরে থেকে যন্ত্রব্যবস্থায় প্রয়োজনী দিক

পরিবর্তন করার জন্যে বাইরের ওই আয়না-ফলকগুলিকে ভাঁজ করে গুটিয়ে নিতে পারবেন অথবা সূর্যরশ্মির সঙ্গে নির্ধারিত কোণে সেগুলিকে খুলে ধরতে পারবেন।

মহাকাশযানের দিক পরিবর্তন ঘটানোর জন্যে পৃথিবীর চৌম্বক-ক্ষেত্রকেও কাজে লাগানো সম্ভব: মহাকাশযানের ভেতরে যদি একটা বিদ্যুৎ-পরিবাহী কণ্ডাক্টর রেখে সেটাকে একটা নির্দিষ্ট ধরনে পৃথিবীর চৌম্বক মেরুবিন্দুর সম্বন্ধপাতে নিয়ন্ত্রিত করা যায়, তাহলে ওই কণ্ডাক্টর ও পৃথিবীর পারস্পরিক বৈদ্যুৎ-চৌম্বক বিক্রিয়ায় মহাকাশযানের গতিমুখ প্রভাবিত হবে। এক্ষেত্রে, ইলেকট্রিক মোটরের নীতিকেই কাজে লাগানো হচ্ছে। মহাকাশযানের ভেতরে রাখা কণ্ডাক্টরের অবস্থান বদলে এবং বিদ্যুৎপ্রবাহ কমিয়ে বাড়িয়ে মহাকাশযানের গতিমুখ ইচ্ছামতো পরিচালিত করা সম্ভব।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর একটি নির্দিষ্ট কক্ষে পরিক্রমারত স্পুৎনিকের চেয়ে গ্রহান্তরযাত্রী মহাকাশযানের যন্ত্রব্যবস্থা কত বেশি জটিল।

"নিরেট" স্পুৎনিক থেকে "জটিল" মহাকাশযান

প্রথম যে স্পুৎনিকগুলিকে মহাশূন্যে পাঠানো হয়েছিল, বাস্তবিক পক্ষে সেগুলি ছিল নানারকম মাপজোকের যন্ত্রপাতি, বেতার ট্রান্সমিটার ও ব্যাটারি ইত্যাদিতে ভর্তি খোল মাত্র। সেজন্যে বিজ্ঞানীরা এদের নাম দিয়েছেন "নিরেট" স্পুৎনিক। কিন্তু, আগে যে কথাগুলি বলা হয়েছে, তার থেকেই বোঝা যাবে যে মনুষ্যবাহী মহাকাশযানগুলির যন্ত্রব্যবস্থা কত জটিল। সেদিক থেকে, "পলিয়ট—১" হল আরেকটি উন্নততর ও জটিলতর যান্ত্রিক সাফল্য। "নিরেট" স্পুৎনিক থেকে জটিল মহাকাশযানে অগ্রগতির অর্থ হল—একদিকে ডিজাইনের অসংখ্য খুটিনাটি জটিলতা বৃদ্ধি, গুণ ও নির্ভরযোগ্যতার উন্নয়ন সাধন এবং অপর দিকে গ্রহান্তর যাত্রার লক্ষ্যে বড় রকমের পদক্ষেপ।

মহাকাশ-স্টেশন

পলিয়ট মহাকাশযানকে নিখুঁত করে তোলার পরবর্তী অধ্যায় হবে নিঃসন্দেহে মধ্যবর্তী "স্পেস স্টেশন" স্থাপন করা—যেখান থেকে দূরপাল্লার মহাকাশযানগুলি ভিন্ গ্রহে রওনা দিতে পারবে কিংবা পৃথিবীতে ফেরার পথে এসে

নামবে। এই মধ্যবর্তী স্টেশনগুলি হবে এক-একটি বিরাটকায় স্পুৎনিক, যদিও সেগুলির চেহারা বা আকার কিরকম হবে তা এখনই বলা যায় না।

ইতিমধ্যেই, স্পেস রকেটগুলির ভার ও আকার বিপুল হয়ে উঠেছে। দূরপাল্লার মহাকাশযাত্রায়—যেমন, ধরা যাক; মঙ্গল বা শুক্র গ্রহে রওনা দেবার জন্যে—ধারণাতীত বৃহদাকার রকেটের প্রয়োজন হবে। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন—এর জন্যে দরকার হবে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমান উঁচু ও আয়তনের কোটি কোটি অশ্বশক্তিসম্পন্ন উৎক্ষেপক-রকেট। সেই জায়গায় পারমাণবিক জ্বালানি-চালিত রকেট ব্যবহার করা যেতে পারলে খুবই সুবিধা হয়। কিন্তু সেটা হবে আরও ঢের বেশি জটিল ও উন্নততর যন্ত্রব্যবস্থা।

অনেকদিন থেকেই বিজ্ঞানীরা এরকম একটা কথা ভাবছেন যে গ্রহান্তরচারী মহাকাশযান একেবারেই পৃথিবী থেকে একটি সম্পূর্ণ ইউনিট হিসাবে রওনা না দিয়ে, তার বিভিন্ন অংশ মহাশূন্যদেশে জুড়ে নিয়ে তারপর তাতে চেপে রওনা হওয়াই ঢের বেশি সুবিধাজনক। মহাশূন্যে ভারহীন অবস্থায় এই অংশ জোড়ার কাজটি হবে অনেক সহজ ও কম ব্যয়সাধ্য। কিন্তু এর জন্যে অবশ্য চাই একটি মধ্যবর্তী স্টেশন। এই স্টেশনটি হবে একাধারে স্থায়ী একটি মহাকাশ-গবেষণাগার এবং গ্রহান্তরগামী মহাকাশযানগুলির "ফিলিং স্টেশন"। বলা বাহুল্য, ওই মধ্যবর্তী স্টেশনটিকেও গড়ে তুলতে হবে তার বিভিন্ন অংশ জুড়ে জুড়ে—পৃথিবীর এক পূর্বনির্ধারিত কক্ষপথে। এর জন্যে চাই ইচ্ছামতো দিক পরিবর্তনে সক্ষম মহাকাশযান—বিজ্ঞানীরা যার নাম দিয়েছেন "ট্রাক স্পেস-শিপ"। এই দিক থেকেই, পলিয়ট-১-এর উৎক্ষেপণ সাফল্য সূচিত করছে মহাকাশ-গবেষণার এক নতুন যুগকে।

সংগ্রাহক

থুম্বা রকেট

গত ২১শে নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টা বেজে ২৫ মিনিটে ভারতের মাটি থেকে ঊর্ধ্বাকাশে প্রথম রকেট ছোঁড়া হল। ক্ষেপণকেন্দ্র ছিল থুম্বা, ত্রিবান্দ্রাম থেকে ১০ মাইল উত্তরে আরবসাগর তীরবর্তী একটি স্থান। রকেটটি অবশ্য ভারতে নির্মিত নয়—এর প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাওয়া গিয়েছিল আমেরিকা ও ফ্রান্স থেকে, ভারতীয় বিজ্ঞানীরা তাদের একত্র করে রকেটটিকে ঊর্ধ্বাকাশে প্রেরণের উপযোগী করে তোলেন।

রকেটটি ছিল দুই স্তরবিশিষ্ট—প্রথম স্তরটির নাম 'নাইকে', দ্বিতীয় স্তরের নাম 'আপাচি', দৈর্ঘ্যে পঁচিশ ফুট এবং মোট ওজন ছিল কুড়ি মণ। রকেটের জ্বালানিরূপে ব্যবহার করা হয়েছিল একটি কঠিন পদার্থ।

রকেটটি ছোঁড়ার ৩½ সেকেণ্ড বাদে প্রথম স্তরের জ্বালানি নিঃশেষ হয়ে যায় এবং তার খোলটি ক্ষেপণকেন্দ্র থেকে আড়াই মাইল দূরে সমুদ্রের জলে গিয়ে পড়ে। রকেটের দ্বিতীয় স্তরের জ্বালানী পঁচিশ সেকেণ্ড বাদে নিঃশেষ হয় এবং তার গতিপথের পেছনে আকাশের বুকে ফুটে ওঠে রক্তবর্ণ সুন্দর সোডিয়াম বাষ্প দিয়ে গড়া একটি মেঘের রেখা। কৃত্রিমভাবে ঐ সোডিয়াম বাষ্পের মেঘ তৈরি করা হয়েছিল। দ্বিতীয় স্তরের খোলটি ক্ষেপণকেন্দ্র থেকে প্রায় একশ পাঁচ মাইল দূরে গিয়ে পড়ে। রকেটটি গতিবেগ অর্জন করেছিল ঘণ্টায় ২৪০০ মাইল এবং পৃথিবী থেকে তার সর্বোচ্চ দূরত্ব দাঁড়িয়েছিল ১১২½ মাইল। রকেটের গতি নিয়ন্ত্রণের জন্যে অবশ্য কোনো যান্ত্রিক ব্যবস্থা তার অভ্যন্তরে ছিল না।

৬২½ মাইল উচ্চতায় রকেটের মাথায় বসানো আধার থেকে সোডিয়াম বাষ্প নির্গত করে যে কৃত্রিম মেঘের সৃষ্টি করা হয়েছিল কন্যাকুমারী, আলামকোট্টা, কোট্টায়ম ও কোদাইকানালে স্থাপিত বিশেষ ক্যামেরা যন্ত্রের সাহায্যে সেই সোডিয়াম-মেঘের আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়। পূর্ব-নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী রকেটের সমগ্র ক্ষেপণ কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়েছিল।

থুম্বা পৃথিবীর চৌম্বক বিষুব-রেখার ওপরে অবস্থিত। ভারতের মাটি থেকে এই রকেট ক্ষেপণের মূল বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর চৌম্বক বিষুবরেখার ওপরে বিদ্যুৎস্রোতের প্রবাহ এবং উর্ধ্বাকাশে বায়ুস্রোতের গতিবিধি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা। অবশ্য ভূ-চৌম্বক বিষুবরেখার ওপর অবস্থিত অন্য যে কোনো জায়গা থেকেই এই পরীক্ষা-কাজ পরিচালিত হতে পারত।

পৃথিবীর সূর্যালোকিত অংশে ভূ-চৌম্বক বিষুবরেখার ওপর একটি বিদ্যুৎস্রোত প্রবাহিত হয়, বায়ুমণ্ডলের আয়নস্তরে পৃথিবীর ৫৬ থেকে ৭০ মাইল দূরত্বের মধ্যে যার অবস্থিতি এবং দু-পাশে যার বিস্তৃতি ৬২ থেকে ১২৫ মাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ৬২ মাইল দূরত্বে রকেটের দ্বিতীয় স্তর থেকে সোডিয়াম বাষ্পের মেঘ নির্গত হবার পর সূর্যালোকিত সেই মেঘ

যেরকম সর্পিল গতি লাভ করেছিল, তার আলোকচিত্রের মাধ্যমে উর্ধ্বাকাশে বায়ুমণ্ডলের গতিবিধি সংক্রান্ত কিছু নতুন তথ্য সংগৃহীত হতে পারে।

ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কমিটির সভাপতি ডক্টর বিক্রম সরাভাই জানিয়েছেন, মহাকাশে শান্তিপূর্ণ অনুসন্ধানের জন্যে ভারতে পরবর্তী রকেট ক্ষেপণ আগামী জানুয়ারি মাসে ঘটতে পারে। থুম্বার বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যে শান্তিপূর্ণ কাজে মহাকাশ গবেষণায় সহযোগিতার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসংঘের সদস্য রাষ্ট্রদের হাতে থুম্বাকেন্দ্র ছেড়ে দেবার জন্যে ভারত সরকার একটি প্রস্তাব করেছেন। সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করে রিপোর্ট দেবার জন্যে রাষ্ট্রসংঘ মহাকাশ কমিটির উদ্যোগে একদল বিজ্ঞানী শীঘ্রই ঐ কেন্দ্রটি পরিদর্শন করবেন।

শঙ্কর চক্রবর্তী

মুকুল দে

কিছুদিন আগে স্থানীয় আর্টস্ অ্যাণ্ড প্রিণ্টস্ গ্যালারি শিল্পী মুকুল দে-র ড্রাইপয়েণ্ট এচিং ও ড্রয়িংয়ের একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে চিত্রকলা-রসিকদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। দীর্ঘকাল পরে শ্রীমুকুল দে-র একসঙ্গে এতোগুলি রচনার এই প্রদর্শনী কলকাতার কলাজগতে এক অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা। স্মৃতিভ্রষ্ট ভারতশিল্পকে যাঁরা তার নিজস্ব জাতীয় উত্তরাধিকারে আত্মপ্রতিষ্ঠ করেছিলেন, সেই অবনীন্দ্র-নন্দলালের অন্যতম সহযোগী ও উত্তরাধিকারী প্রবীণ শিল্পী মুকুল দে-র এই প্রতিনিধিস্থানীয় রচনাগুলি আমাদের আধুনিক শিল্পীদের আত্মোপলব্ধিতে সহায়তা করতে পারে। আমাদের যেসব অন্যমনা উদ্‌ভ্রান্ত মডার্নিস্ট চিত্রকর আজ নিজেদের ভুলতে বসেছেন, তাঁদের নিজেদের চেনার জন্যে এই ধরনের প্রদর্শনীর আজ বহুল প্রয়োজন।

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের জাতীয় চেতনার নব বিকাশের যুগে, ঐতিহ্যধারাবাহী ভারতীয় চিত্রপদ্ধতির অনুশীলন ছিল নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। অবনীন্দ্র-নন্দলাল-প্রবর্তিত, এবং মুকুল দে-র মতো কয়েকজন শিল্পী কর্তৃক পুষ্ট, সেই নব্য-ভারতীয় চিত্রপদ্ধতিকে যাঁরা "পুরাতনের চর্বিতচর্বণ", "রিভাইভ্যালিজম", "মিউজিয়ম পীস" ইত্যাদি বলে নস্যাৎ করে দিতে চাচ্ছেন, তাঁরা এর এই ঐতিহাসিক পটভূমিটুকু স্মরণে রাখেন না—অথবা জানেন না। ভারতশিল্পের জাতীয় ধারাকে যাঁরা নতুন এক মূল্যবোধের ভিত্তিতে স্বপ্রতিষ্ঠ করেছেন তাঁদের সম্বন্ধে, আমাদের চিত্রকলার নিজস্ব ঐতিহ্যের নবরূপায়নের ও নবমূল্যায়নের বিষয়ে, এক নির্বোধ উন্নাসিক অবজ্ঞা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় বিলিতী মালিকপুষ্ট (বর্তমানে দেশী-বিলিতী সংকর-মালিকানাধীন) একটি ট্যাস দৈনিকের পাতায়।

শ্রীমুকুল দে-র এই রচনাগুলি দেখে আরেকবার উপলব্ধি করা গেল যে ভারতশিল্পে সেই নব্য জাতীয় ধারা প্রবর্তনে উদ্যোগী শিল্পীরা তার ঐতিহ্যানুসারী মৌল চরিত্র অক্ষুণ্ণ রেখে, এর রেখানির্ভর গঠনপদ্ধতির মূলগত গুণগুলিকে না

…য়ে, চিত্রের সংস্থাপনে আর বিন্যাসে পাশ্চাত্ত্য রীতিপদ্ধতিকে কতো সহজে কাজে লাগিয়েছিলেন।—এই দিক থেকেই নব্য-ভারতীয় চিত্রশিল্পীরা আমাদের জাতীয় শিল্পের ধারায় এক নতুন মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

শিল্পী মুকুল দে-র রচনার সবচেয়ে বড়ো গুণ হল তার পরম্পরাগত ভারতীয় লিনিয়রিজ্‌ম্। প্রায় প্রত্যেকটি রচনাতেই তাঁর সেই সুচারু রেখার বিন্যাস আমাদের খাঁটি দেশজ লিনিয়রিজ্‌ম্-এর সমস্ত গুণগুলিকে আত্মস্থ করেছে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে—নিসর্গবর্ণনা, প্রতিকৃতি আর কাহিনীচিত্র—এই তিন শ্রেণীর রচনা প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিল এবং প্রত্যেকটিই অপূর্ব রেখার সুষমায় সমণ্ডিত। পোর্ট্রেটগুলির প্রায় প্রত্যেকটিতেই যেমন ফুটেছে ব্যক্তিচরিত্রের বৈশিষ্ট্যের ছাপ, তেমনি অন্যান্য ছবিগুলিতে—বিশেষত নিসর্গদৃশ্যগুলিতে—অভিব্যক্তি পেয়েছে শিল্পীর গীতিকাব্যধর্মী কবিমনের পরিচয়। সমকালীন সমাজজীবনের নানা ব্যর্থতা-বেদনার দিক তাঁর মনকে স্পর্শ করেছে—মন্বন্তর, …তিক্ষ ইত্যাদির পটভূমিকায় রচিত ছবিগুলি তার প্রমাণ।

কল্যাণ সেন

আমাদের মতো সাধারণ পথচলতি লোক, যারা এই শহরের গুটিকয়েক বাঁধা জায়গায় সারা বছর ধরে বিভিন্ন চিত্রপ্রদর্শনী দেখে বেড়ায়, তারা যে আমাদের চিত্রকলার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বেশ কিছুটা বিমূঢ়, সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। আমাদের আর্টের ক্ষেত্রে ইদানিং আপন-সত্তাহীন উদ্‌ভট এক বিজাতীয়তার যে উৎকট রক-'ন্-রোল চলেছে, তাকে উৎসাহিত করার পেছনে কোনো কোনো স্নব মহলের অবদান তো আছেই। আর আছে—এদেরই হাততালির তালে তালে এক শ্রেণীর শিল্পীর বাজারী তাঁবুর নিচে নাচওয়ালী-…ত অঙ্গভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন-ফরাসী ট্যুরিস্টদের পকেট-লক্ষ্য ব্যবসায়িক …পাঙ্গ-দৃষ্টি। দুর্ভাগ্যের কথা, এঁরাই আজ সংখ্যাগরিষ্ঠ।

কিন্তু সৌভাগ্যের কথা, মাঝে মাঝে এর ব্যতিক্রম চোখে পড়ে এবং তা পড়ে বলেই আমাদের—পথ-চলতি সাধারণ চিত্রকলা-আগ্রহী মানুষদের—ওই বিমূঢ়তাটুকু হয়তো এখনও পুরোপুরি নৈরাশ্যে পরিণত হয়নি। এই রকম একটি ব্যতিক্রম হলেন শিল্পী কল্যাণ সেন। সম্প্রতি আর্টস্ অ্যাণ্ড প্রিণ্টস্ গ্যালারী ও গ্র্যাণ্ট অ্যাড্‌ভার্টাইজিং ইন্‌কর্পোরেটেডের যুক্ত উদ্যোগে শ্রীসেনের অনেকগুলি রচনার একটি সুন্দর প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। চিত্রকলার

ভাষাকে সর্বজনীন করে তোলার জন্যেই যে তার জাতীয় চরিত্রের উৎস সন্ধানে যেতে হবে, তার ট্র্যাডিশনের মূল উৎস থেকে রস আহরণ করতে হবে, সে কথাটা আবার নতুন করে মনে হল কল্যাণ সেনের ছবিগুলি দেখে।

শ্রীসেনের রচনা প্রধানত অলঙ্কার-নির্ভর, প্যাটার্ন-প্রধান। দ্বিমাত্রিক গভীরতায় ক্রমপ্রসারী মিশ্রিত রঙ। পরিপ্রেক্ষিত ফ্ল্যাট। গাছপালা, মাছ-পশু আর মানুষের ফিগারগুলি স্টাইলাইজড্।—এ সবই আমাদের লোকশিল্পের চরিত্রবৈশিষ্ট্য। এবং, কল্যাণ সেন লোকশিল্প থেকে যেমন প্রেরণা নিয়েছেন, তেমনি পাশ্চাত্ত্য চিত্ররীতির কতকগুলি গুণবৈশিষ্ট্যও তাঁর রচনায় সুন্দরভাবে সমন্বিত—যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ফর্মের ছন্দপূর্ণ বিষমানুপাতিক ভাঙচুর। কল্যাণ সেনের রচনার উজ্জ্বল টেক্সচারে আর রেখার বলিষ্ঠতায় ভারতীয় চিত্রকলার স্টাইলাইজড্ ভাষা অতি সুন্দর রূপে সমন্বিত হয়েছে পাশ্চাত্ত্য নীতির বাগবৈশিষ্ট্যের সঙ্গে। তাঁর রচনার সহজ স্বাচ্ছন্দ্য দর্শকদের গভীর আনন্দ দিয়েছে।

মূক-বধির কিশোর শিল্পীদল

এই মাসের গোড়ার দিকে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস্ হলে কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের ছাত্রদের আঁকা ছবির মেলা বসিয়ে এই স্কুলের কর্তৃপক্ষ আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। প্রদর্শনীটি দেখে বারবার মনে হল—এখানকার ছাত্ররা সরাসরি জীবনের পাঠশালা থেকেই তাঁদের সৃষ্টির প্রেরণা আহরণ করছেন। ৬ থেকে ১৬ বছর বয়সী প্রায় ২০ জন ছেলের শতাধিক ছবি আর কাঁচা মাটির কাজগুলিতে এমন সুন্দর একটি স্বাচ্ছন্দ্য আর আনন্দ অভিব্যক্তি পেয়েছে যা শিশু-কিশোর মনের সহজ কল্পনার জগৎ থেকে স্বতোৎসারিত।

অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সীদের অনেকের কাজের মধ্যেই বেশ একটি পরিণত রূপদৃষ্টির ও কারুকুশলতার পরিচয় পাওয়া গেল—যেমন, অমল রেবা (১৬), গুরুদাস কুণ্ডু (১৬), নারায়ণ দত্ত (১৫), সরল দাস (১৩), মহম্মদ মহসীন (১৩), ত্রিদিব রায় (১৩) প্রভৃতির রচনায়।—বিশেষত মহম্মদ মহসীনের রচনায় পারিপার্শ্বিক জীবন ও সমকালীন ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে আশ্চর্য সচেতনতার পরিচয় আছে। তেমনি ৬।৭।৮ বছর বয়সী আশীষ মৈত্র, রাধেশ্যাম ঘোষ,

...দের পাঠক প্রভৃতির ছবিতে আর শুকিয়ে-নেওয়া মাটির ওপরে রঙ-ছিটানো ...লিয়ে আছে অনুসন্ধিৎসু শিশুমনের অপূর্ব কল্পনাশক্তির পরিচয়।

মূক-বধির বিদ্যালয়ের শিল্প-শিক্ষককে ধন্যবাদ—তিনি তাঁর শিশু-কিশোর ছাত্রদের দিয়েছেন সৃষ্টির স্বাধীনতা, যে-স্বাধীনতা তাদের নিজ নিজ শিল্পী-সত্তার বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য।

আশি বছরে শিল্পাচার্য

আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে "পঞ্চাশ বছরের কিশোর গুণী নন্দলাল বসুর প্রতি" আশীর্বাদ জানিয়ে "সত্তর বছরের প্রবীণ যুবা" রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি অবিস্মরণীয় কবিতা রচনা করেছিলেন। রূপস্রষ্টা সেই কিশোর গুণী গত ৩রা ডিসেম্বর তারিখে স্বয়ং আশি বছরের প্রবীণ যৌবনে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

নন্দলালের জীবনব্যাপী শিল্পকর্মে যে ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্য, তার মূল কথাটি হল—তাঁর রূপসন্ধান প্রথম থেকেই নব নব অভিযানে বের হয়েছে, নির্দিষ্ট কোনো রীতিপদ্ধতির মধ্যে তিনি নিজেকে আটকে যেতে দেননি। ভারতীয় চিত্রকলা—বিশেষত বাংলার লোকশিল্প—যেমন তাঁর প্রেরণা জুগিয়েছে, তেমনি প্রেরণা নিয়েছেন তিনি ইওরোপীয় চীনা জাপানী চিত্রকলার বিভিন্ন ধারা থেকেও। বিশ্বশিল্পের রূপস্রোতে তিনি স্নান করে এসেছেন। নিজের দেশের ঐতিহ্য আর জাতীয় ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গে অন্য দেশের শ্রেষ্ঠ আঙ্গিক-আদর্শকে আত্মস্থ করে তাকে দেশের মনের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েই তাঁর রীতিবৈশিষ্ট্য তৈরি হয়েছে। তাই, নন্দলালের প্রত্যেকটি তুলির টানে আশ্চর্য সৌন্দর্য নিয়ে মূর্ত হয়েছে আমাদের দেশের নিজস্ব এক মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ আনন্দ।

নন্দলালের আশি বছর বয়ঃপূর্তি উপলক্ষ্যে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে সমস্ত দেশবাসীর সঙ্গে আমরা আমাদের হৃদয় যোগ করছি। জীবতু শরদঃ শতং।

রবীন্দ্র মজুমদার

চ ল চ্চি ত্র - প্র স ঙ্গ

রুশী-বিস্ময়

Das russische wunder—Directed & Produced by Annelie and Andrew Thorndike : D E F A Studios. G. D. R :

সাম্প্রতিক সোভিয়েত শিল্প সাহিত্য চলচ্চিত্র বিতর্ক প্রসঙ্গে একটি ছবির নাম আমরা ঘুরে ফিরে বারবার শুনেছি। স্বয়ং শ্রীক্রুশ্চেভের বক্তৃতাতেও তার সপ্রশংস উল্লেখ ছিল। কিন্তু ছবিটি এখনও এদেশে আমরা চোখে দেখিনি বলে ক্রুশ্চভের ঐ উক্তির যাথার্থ্য ও তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গমে আমাদের সুযোগ ছিল কম। সম্প্রতি সে সুযোগ যথাতিরিক্তভাবে ঘটে যাওয়ায়, আমাদের যাদের এই ছবিটি দেখার সৌভাগ্য হয়েছে, বুঝেছি যে এক অসাধারণ চলচ্চিত্র সৃষ্টির সম্মুখীন হয়েছি আমরা—তথ্যচিত্র ডকুমেণ্টারির ইতিহাসে এমন একটি সৃষ্টি সত্যিই এক অসাধারণ গুরুত্ব বহন করছে।

আরও, সৌভাগ্য আমাদের এই জন্যই যে সেই সঙ্গে এই চিত্রের নির্মাতা ও স্রষ্টাদ্বয় থর্ণডাইক দম্পতিকেও আমরা সেই সঙ্গে আমাদের মধ্যে পেয়েছিলাম কলকাতার সোভিয়েত দূতস্থানে তাঁদের জন্য আয়োজিত এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে। সোভিয়েত কন্সাল-জেনারেল ও জর্মন গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের বাণিজ্য প্রতিনিধির আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে এই জর্মন ডকুমেণ্টারি ফিল্মটির দুই দিন ধরে দুইটি খণ্ডের প্রদর্শনী প্রকৃতই দর্শকদের অভিভূত করে রেখেছিল।

শ্রীমতী আন্নেলিয়ে ও শ্রীঅ্যাণ্ড্র থর্ণডাইক এই অসাধারণ ডকুমেণ্টারি ফিল্মটি পরিচালনা করতে গিয়ে, ইংরেজী সাব-টাইটেল-এ যার নাম দেওয়া হয়েছে "দি রাশ্যান মিরাকল", তাতে নিজেরাও বলা চলে, অসাধ্যসাধন করেছেন। দুই অংশে বিভক্ত এই "রুশী-বিস্ময়" বিশ-শতকের বিশ্ব ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে আজকের সোভিয়েতে কমিউনিস্ট সমাজ গঠনকার্য পর্যন্ত যে বিরাট প্রেক্ষাপট উন্মোচন করেছে, চলচ্চিত্র শিল্পজগতে, সজীব ডকুমেণ্টারিতে এ রকম কঠিন ও সফল প্রয়াসকে অভূতপূর্বই বলতে হয়। এই তথ্যচিত্রটি পৃথিবীর সেরা তথ্য-চিত্রগুলির প্রথম সারিতেই পাশাপাশি আসন পাবে।

"রুশী-বিস্ময়" সত্যই বিস্ময়কর। কেননা, এ হল পৃথিবীর ইতিহাসের সেই মোড় ফেরান বিপ্লবের চলচ্চিত্র কাহিনী, অদ্বিতীয় বিপ্লব, অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। এ ছবি রুশরা নির্মাণ করেন নি, করেছেন জর্মনরা। রুশ চলচ্চিত্র দর্শকদের জন্য নয়, যতটা এ ছবির আবেদন হল এশিয়া, আফ্রিকা লাতিন আমেরিকার মানুষের জন্য। যে পশ্চিমী মহলগুলি রুশ বিপ্লবকে একটা "হেঁয়ালি" বলে অবিরত প্রচার চালিয়ে আসছিল, সেই সব দেশেরই জনগণের জন্য। কারণ, এ চলচ্ছবি তুলে ধরেছে তথ্য ও সত্যকে, শত অপপ্রচারের কুহেলিকার আবরণকে ছিঁড়ে দিয়ে। যে দেশ মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর আগেও ইওরোপের শিল্পপ্রধান দেশগুলির ধারে কাছেও ছিল না, সেই দেশ সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ, গৃহযুদ্ধ, আর হিটলারী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তাণ্ডব ধ্বংসকে অতিক্রম করে দুনিয়ার সব সেরা পুঁজিবাদী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমকক্ষ হয়ে উঠল। সম্পূর্ণ আপন শ্রমে, সম্পদে, বিজ্ঞান ও কারিগরীতে ছাড়িয়ে গেল সমস্ত দেশকে—স্থাপন করল মহাকাশে প্রথম স্পুৎনিক, পাঠাল মহাব্যোমে প্রথম মানুষ—এ কি করে সম্ভব, কোন "বুর্জোয়া মহাসত্যে"? জারতন্ত্র পতনের পর পশ্চাদপদ রাশিয়ায় এই দারুণ প্রায়-অসম্ভব দ্রুত অগ্রগতির চাবিকাঠি কোনখানে? পশ্চিমী প্রচারকদের কাছে এ রুশী ধাঁধাঁ, "রুশী বিস্ময়" চলচ্চিত্রে সেই চাবিকাঠির, সেই "যাদুমন্ত্রেরই" সন্ধান দেয়; যার নাম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অপরাজেয় শক্তিই আশ্চর্যভাবে রূপায়িত করেছেন থর্ণডাইক দম্পতি একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই চলচ্চিত্রে। এ তথ্যচিত্রের মালমশলা সংগ্রহের জন্য পাঁচ বৎসর কাটিয়েছেন সোভিয়েত ইউনিয়নে, উপকরণ সংগ্রহ করেছেন নানান দলিল দস্তাবেজ ঘেঁটে, গবেষণা করে। মস্কো, লেনিনগ্রাদ, লাইপৎজিগ, বার্লিন, মিউনিক, ওয়ারশ, প্রাগ, ভিয়েনা, প্যারিস, লণ্ডন, নিউইয়র্ক—দুনিয়ার কোনো রাজধানীই এই গবেষক-চিত্রনির্মাতাদের অনুসন্ধানের এক্তিয়ার থেকে বাদ পড়ে নি। এরকমভাবেই তাঁরা সংগ্রহ করেছেন, চারশ'র বেশি ঐতিহাসিক দলিল, ফটোগ্রাফ নিয়েছেন চার হাজার, মোট এক লক্ষ ফিল্ম তাঁরা আলোকচিত্র গ্রহণে ব্যবহার করেছেন।

ছবির প্রথমাংশে দেখি বিজয়ী অক্টোবর বিপ্লবে জারতন্ত্র উচ্ছেদের পর মস্কোর রেড স্কোয়ারে সোভিয়েত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় লেনিনের সেই বিখ্যাত আহ্বান দৃশ্য—সেদিনের সেই প্রায়-নিঃস্ব সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণকে,

শ্রমিক-কৃষক-বুদ্ধিজীবীকে ডাক দিয়ে বলছেন শিল্পে ও সম্পদে ধনী শ্রেষ্ঠ পুঁজিতন্ত্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে নাগাল ধরে তাকে ছাড়িয়ে যাবার জন্য। আর এই অংশের শেষে দেখলাম সেই সোভিয়েত ইউনিয়নই আজ য়ুরি গাগারিনকে সর্বপ্রথম মহাকাশে প্রেরণ করে মানবিক প্রয়াসের চরম সাফল্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই "রুশী বিস্ময়" আগাগোড়া অভিভূত করে রাখে। ছবির দ্বিতীয়াংশে সোভিয়েতের দ্বাবিংশ পার্টি কংগ্রেসে কমিউনিজম গঠনের কর্মসূচী গ্রহণ ও লেনিন নির্দেশিত পথে ওদেশের শিল্প, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সমাজ জীবনে কী বিরাট ব্যাপ্তি ও সর্বতোমুখী বিকাশ ঘটেছে, দৃশ্যাবলীর পর দৃশ্যাবলীতে তার অভিব্যক্তিতে মুগ্ধ হই। দুই অংশে সমাপ্ত ঘটনাবহুল এই ডকুমেণ্টারিতে থর্ণডাইক দম্পতি পার্থক্যমূলক ও তুলনামূলক বিচার পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন।

আজ থেকে অর্ধশতাব্দী আগে জারতন্ত্রের রাশিয়ায় ছিল দারিদ্র্যের চরম, বেকারি, নিরক্ষরতা সর্বজনীন। শ্রমজীবী মানুষের আবাস ছিল যেন প্রাক্-ইতিহাসের। লক্ষ লক্ষ মানুষের ভাগ্য ছিল বন্দীর কঠোর শ্রম, নির্বাসন, গুলি ও পুলিশের নির্যাতন। আর তার পাশেই ছিল শ্রমিক ও কৃষকের ঘর্মে-কর্মে পুষ্ট মুষ্টিমেয়ের ধন দৌলত, ব্যসন-বিলাস।

অক্টোবর বিপ্লব এই সমস্ত কিছুর রূপান্তরের সূচনা করল, একেবারে ভিত্তি ও বনিয়াদ বদলে। আজ সেই সোভিয়েত রাষ্ট্র ৪৬ বছর পূর্ণ করেছে। বিস্ময়কর হল, এই ৪৬ বছরের মধ্যে ২০টি বছরই গিয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর সাম্রাজ্যবাদীদের চাপান যুদ্ধ বিগ্রহে এবং যুদ্ধ বিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠনে। সুতরাং থাকল মাত্র ২৫টি বছর। এই পঁচিশ বছরই ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে, অসাধ্যসাধন হয়েছে। পশ্চাপদ অবস্থা থেকে অভূতপূর্ব অগ্রগতিতে, বিরাট বিরাট পদক্ষেপে, পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ কক্ষপথে স্থাপনে, মহাকাশ বিজয়ী প্রথম পুরুষ গাগারিন, প্রথম নারী ভ্যালেন্তিনা তেরেশকোভা আর তাঁর সহযোগীদের মহাকাশ আবিষ্কারের রোমাঞ্চকর অভিযানে—এই "রুশী বিস্ময়" সাধন হয়েছে।

এই চলচ্চিত্র নির্মাতা থর্ণডাইক-দম্পতি এই ফিল্মে ব্যবহার করেছেন সেই সব প্রতিটি সাধারণ অথচ প্রকৃতই অসাধারণ অধ্যবসায়ী সোভিয়েত নরনারীর মুখাকৃতি, শ্রমিক ও কৃষক যাঁরা আজ নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্তা, তাঁদের জীবনালেখ্য এই ছবিটির গতিশীলতায় জীবন্ত ও মর্মস্পর্শী হয়ে ফুটে উঠেছে। অবশ্য যত উপকরণ ও কাহিনী তাঁরা সংগ্রহ করেছিলেন, ছবির দৈর্ঘ্য ক্রমেই

বেড়ে যায় দেখে তার অনেকখানিই তাঁরা ছবিতে সংযোজনার অবকাশ পান নি। ছবির দ্বিতীয়াংশে এ রকম যে একজনের জীবনালেখ্য আমরা দেখতে পাই তাঁর নাম ভাসিলি এমেলিয়ানোফ। ছবিতে আমরা দেখি, ভোরোনেজ শহরের কাছে আজ যেখানে শক্তিশালী পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে, সেখানে একদা ছিল একটি অখ্যাত গ্রাম। অক্টোবর বিপ্লবের আগে চরম দারিদ্র্যে পীড়িত ঐ গ্রাম। গরীব কৃষক এমেলিয়ানোফের বৃহৎ পরিবারে বালক ভাসিলির জন্ম। পাঁচটি জীবিত সন্তানের সেই জ্যেষ্ঠ। ছোট এক বালকের ছবি ভেসে ওঠে পর্দায়। সেই বালক একদিন হল অধ্যাপক, বিজ্ঞান একাদেমির করেসপণ্ডিং সদস্য, পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের রাষ্ট্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি। তাঁর জীবনে দেখি তিনি অধ্যয়ন করছেন, গৃহযুদ্ধে বিপ্লবকে রক্ষা করার জন্য অস্ত্র হাতে পরিখায় লড়ছেন, ল্যাবরেটরিতে অক্লান্ত গবেষণা করেছেন, কর্মে ও সাধনায় আত্মনিযুক্ত একজন সোভিয়েত মানুষ। ভাসিলি এমেলিয়ানোফের জীবনপথ একটি ব্যতিক্রম নয়। ও-দেশের কোটি কোটি মানুষেরই জীবনধারার একটি। এ রকমই হলেন কাজাখস্তানের মহিলা ডাক্তারটি, উরালের তরুণ শ্রমিক, সাইবেরিয়ার নতুন শিল্পনগরীর শ্রমিক মানুষ।

১৯১৮-র প্রথম, লেনিন এক সোভিয়েত সভায় দাঁড়িয়ে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের জন্য প্রত্যেকটি শ্রমিককে সর্বশক্তি নিয়োগের ডাক দিয়ে গিয়েছিলেন। সেই মহাসাধনার এক একটি অধ্যায়ের পর অধ্যায় খুলে যায় ছবিতে দৃশ্যের পর দৃশ্য, পট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। ছবির শেষ হয় লেনিনেরই সমাধিভূমির পাশে সার দিয়ে দাঁড়ান সারি সারি, বিরাট মানুষের—সারা সোভিয়েত ও পৃথিবীর নানাদেশী আন্তর্জাতিক এক সারির বিমুগ্ধ ক্লাসিক একটি দৃশ্যে, রেডস্কোয়ারের চারদিকে নিষ্কলুষ সাদা তুষারপাতের মধ্য দিয়ে এই আন্তর্জাতিক মিছিল এঁকেবেঁকে চলেছে, চলেছে—লেনিনের স্মৃতিসৌধের দ্বারের দিকে, বিনত শ্রদ্ধায়।

একটি কথা থাকে। এই অসাধারণ ঐতিহাসিক ডকুমেণ্টারির এদেশে সর্বসাধারণের জন্য শো-হাউসগুলিতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রদর্শনের পথে বাধা কোথায়?

সত্যেশ রায়

পাঠকগোষ্ঠী

ভাষাচিন্তা বনাম উপন্যাস

'পরিচয়'-সম্পাদক সমীপেষু—

মহাশয়,

'পরিচয়'-এর গত শ্রাবণ, ১৩৭০ সংখ্যায় শ্রীযুগান্তর চক্রবর্তী লিখিত "উপন্যাস: ভাষা ও চিন্তা" প্রবন্ধের প্রথমাংশে শ্রীকমলকুমার মজুমদারের "অন্তর্জলী যাত্রা" উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা পড়ে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয়েছি। কিংবা হয়তো এতে বিস্ময়ের কিছু নেই; কেননা, একেবারে একেলে গল্প-কবিতার লেখক ও তার সহমর্মী সমালোচকদের রচনা এতই ব্যক্তিক (subjective) ও অনন্য যে আদারব্যাপারি তৃতীয় ব্যক্তির কাছে তার প্রায় সবটুকুই বিস্ময়। আর এ-বিস্ময় এখন আমাদের এতটা গা-সহা হয়ে গেছে যে আজ বিস্মিত হওয়াটাই হয়তো বিস্ময়কর! তবু যে বিস্মিত হয়েছি তার কারণ নিম্নরূপ। যুগান্তরবাবু ওই প্রবন্ধে উপন্যাসের মূল্যায়ন-প্রসঙ্গে যে-সব সামান্য (general) প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তা থেকে কেমন-যেন মনে হয়েছে আমাদের সেকেলে সমালোচকদের মামুলি ইতিহাসবোধ আর বিষয়মুখ (objective) সাহিত্যদৃষ্টি তাঁর সম্পূর্ণ আয়ত্ত। তবু "অন্তর্জলী যাত্রা"-র বিচারের ক্ষেত্রে নিজের উত্থাপিত মৌল নন্দনতাত্ত্বিক প্রশ্নগুলিকে নিজেই পাশ কাটিয়ে গিয়ে, সর্বপ্রকার যুক্তি-প্রমাণ উপেক্ষা করে নিজের ব্যক্তিগত ভালোলাগাকে সমালোচনার আসনে কেন যে তিনি বসালেন তাই ভেবেই আমাদের বিস্ময়। শুধু তাই নয়। মনে সর্বক্ষণ প্রশ্নের কাঁটা খচখচ করতে থাকলে কোন ভদ্রসন্তানের পক্ষে মাথা ঠাণ্ডা রেখে আপন ভালোবাসার কথাটুকু নির্ভেজাল ব্যক্ত করা চলে? যুগান্তরবাবুরও সেই দশা! ফলে তাঁকে আগাগোড়া পরস্পরবিরোধী উক্তি করতে হয়েছে। যেমন, কখনো কমলকুমার মজুমদার-প্রসঙ্গে তিনি বলছেন:

"কোনো কোনো লেখকের ক্ষেত্রে ভাষার সহিত জড়িত এই সমস্যা (দীর্ঘদিনের বহুব্যবহারে শব্দ, বাক্যাংশ ও ভাষা জীর্ণ ও অব্যবহার্য হয়ে পড়ার সমস্যা—পত্রলেখক) ও প্রশ্ন এমন চরম, নির্বিকল্প মূল্য পায় যে

উক্ত লেখকের সাহিত্যচর্চা এই সমস্যার সমাধান ও প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের ইতিহাসমাত্র বলা চলে।"

আবার কখনো ওই প্রসঙ্গেই:

"...ভাষা ও ভাবনার অব্যর্থ ঐক্যে, অভিপ্রেত তাৎপর্যে কমলকুমার মজুমদারের আশ্চর্য সিদ্ধি না-মেনে উপায় থাকে না।"

'অন্তর্জলী যাত্রা'র আলোচনায় কখনো যুগান্তরবাবু বলছেন:

"...মহৎ উপন্যাসমাত্রই···কবিতার লক্ষণ দ্বারা আক্রান্ত হয়···"

এবং:

"'অন্তর্জলী যাত্রা'-র কালচিত্রণ ও প্রতিবেশ রচনায় কমলকুমার মজুমদারের ঔপন্যাসিক ক্ষমতা যদিও বর্তমান বাংলাসাহিত্যে অভূতপূর্ব, তথাপি···"

'তথাপি' কী? না—

"'অন্তর্জলী যাত্রা'র ভাষা ও বিষয়-ভাবনায় কমলকুমার মজুমদার যে-সমস্যা উপস্থাপিত করেন সে-সমস্যা উপন্যাসের নয়, কবিতার।"···"'অন্তর্জলী যাত্রা'-র সর্বত্র কবিতার শুদ্ধ কাজ।"

এবং পরিশেষে:

"'অন্তর্জলী যাত্রা' এক অমোঘ কাব্যের মর্মস্থলে স্থাপিত।"

বুঝুন একবার ব্যাপারখানা! ভাষা-ব্যবহারের সমস্যা যে-লেখকের কাছে "চরম, নির্বিকল্প মূল্য পায়," যাঁর "সাহিত্যচর্চা" "এই সমস্যা" সমাধানের "ইতিহাসমাত্র বলা চলে," তিনিই যে কী করে "ভাষা ও ভাবনার অব্যর্থ ঐক্যে, অভিপ্রেত তাৎপর্যে···আশ্চর্য সিদ্ধি" অর্জন করেন, অন্তত আমাদের আলোচ্য সমালোচনা থেকে তার কোনো হদিস মেলে না। আবার এও আমাদের বিনা প্রশ্নে শুনতে ও মানতে হয়, উপন্যাস-শিল্পের এই "আশ্চর্য সিদ্ধি," মহৎ উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত "'অন্তর্জলী যাত্রা'র ভাষা ও বিষয়-ভাবনায় ···যে-সমস্যা উপস্থিত···সে-সমস্যা উপন্যাসের নয়, কবিতার"! অহো! "'অন্তর্জলী যাত্রা' এক অমোঘ কাব্যের মর্মস্থলে স্থাপিত!"

এখন বিমূঢ় পাঠকের প্রশ্ন এই: 'অন্তর্জলী যাত্রা' যদি কবিতাই হয় তবে উপন্যাসতত্ত্ব সম্পর্কে যুগান্তরবাবুর এত জ্ঞানগম্ভীর গবেষণার প্রয়োজন কী ছিল? তাছাড়া, উপন্যাস বা কবিতা যাই হোক না কেন, আলোচ্য শিল্পকর্মটি সম্বন্ধে সমালোচকের বিশ্লেষণমূলক আলোচনাই বা কোথায়? শুধু তাঁর কতগুলি বিক্ষিপ্ত জমকালো স্তুতিবাচনকেই কি আমরা ঋষিবাক্য বলে ধরে নেব?

নাকি, তিনি মনে করেন, তাঁর আলোচনাটিও আর একটি সহৃদয়হৃদয়সংবাদী 'অমোঘ কবিতা', ওরফে, একটি যথার্থ একেলে অ্যাংরি-হাংরিআলিস্ট কাব্য-সমালোচনা?—বেচারি যুগান্তরবাবু! তাঁর অবস্থা বিষ্ণু দে-র কাব্যের সেই 'ডলু'র মতো—"ঝগড়া করতে গেলেও ডলুর প্রেমই জাগে"! সাহিত্য-আলোচনাও নিশ্চয় প্রেমেরই প্রকাশ; তবে সে প্রেম কি নিছক ব্যক্তিগত ভালোলাগা, না বিচারবুদ্ধি ও রুচিবোধের হরিহর-মিলনে তার স্ফূর্তি?

অবশ্য এহ বাহ্য। যুগান্তরবাবুর আলোচনার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল, 'অন্তর্জলী যাত্রা'-র তথা কমলকুমার মজুমদারের ভাষাচিন্তা ও ঐতিহ্যবোধ সম্পর্কে আলাপ। যুগান্তরবাবু বলছেন, "·· কথা এই যে, 'অন্তর্জলী যাত্রা'-র স্বরূপ ও সিদ্ধি নিয়ে মতামত যাই হোক না কেন, ভাষাচিন্তা ও ঐতিহ্যবোধের যে মৌলিক প্রশ্ন কমলকুমার মজুমদার উত্থাপন করেন, বর্তমান বাংলাসাহিত্যে তা দিগ্‌নির্দেশকারী।"—কিন্তু কমলবাবুর 'ভাষাচিন্তা' বস্তুটি কী? যুগান্তরবাবুর ভাষায়, "কমলকুমার মজুমদারের অন্যান্য রচনার ন্যায় 'অন্তর্জলী যাত্রা'-ও সেই ভাষায় রচিত যা চলিত অর্থে সাধুভাষা। কিন্তু এই শুদ্ধ ভাষা শুধুমাত্র ক্রিয়াপদের প্রচলিত সাধুত্বের উপর নির্ভর করে না।···বাংলা গদ্যভাষার ধারাবাহিক বিবর্তনকে 'অস্বীকার করে', শুদ্ধতার প্রয়োজনে অদ্যাবধি ব্যবহৃত বাংলা গদ্যের সকল অনুষঙ্গের অতীত, ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন গদ্যের শুদ্ধ উৎসে কমলকুমার মজুমদার আত্মমুক্তির পথ খোঁজেন। এবং প্রাচীনতার উৎস সন্ধানে, মনে হয়, কমলকুমার মজুমদার ইংরেজপূর্ব বাংলা গদ্যভাষার সুপ্রাচীন নিদর্শন অবধি অগ্রসর হন।"

সত্যি, বাংলা ভাষার মামুলি ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের সাহিত্য-সমালোচকের জ্ঞানের এহেন দৈন্য দেখে আমরা হতচকিত। তাঁর সেন্টিমেন্টাল হতে পারার অপরিসীম ক্ষমতায় তো রীতিমত বিমূঢ়ই। কিন্তু ব্যাপারটা কী? বর্তমানে কিংবা আজ পর্যন্ত যে বাংলা গদ্য প্রচলিত, আমাদের আঠারো বা উনিশ শতকের তথাকথিত 'প্রাচীন' গদ্য (যুগান্তরবাবুরা নিতান্ত নবীন, তাই একশো বা দু-শো বছরের পুরনো ভাষাই তাঁদের কাছে কখনো 'প্রাচীন', কখনো 'সুপ্রাচীন' ঠেকে!) কি সেই আধুনিক গদ্যের "সকল অনুষঙ্গের অতীত"? আমাদের আধুনিক গদ্য কি তবে সম্পূর্ণ ভুঁইফোঁড়? তাহলে, ঠিক কোন্ সালে কার মস্তিষ্ক থেকে এই ভুঁইফোঁড় পদার্থটির জন্ম হল? কোন্ সাল থেকে কোন্ দৈবদুর্বিপাকে-বা যুগান্তরবাবুকথিত 'প্রাচীন' গদ্যের

বিলোপসাধন ঘটল?—আসলে উক্তিটি ভাষা-ইতিহাসের বিচারে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানবিরোধী ও অর্থহীন। আঠারো ও উনিশ শতকের বাংলা গদ্যের বিশশতকী গদ্যে পরিণতি, যুগপৎ ইংরেজি বা ইংরেজি-প্রভাবিত এবং সংস্কৃতশব্দ সম্ভার, বাক্য-বিন্যাস রীতি ইত্যাদির প্রভাব সত্ত্বেও, ভাষার ধারাবাহিক বিবর্তনের ফলমাত্র। কাজেই একমাত্র প্রাচীনতাপ্রীতির অন্ধতায় ছাড়া বাস্তবে কোথাও আধুনিক গদ্যের "সকল অনুষঙ্গের অতীত" প্রাচীন গদ্যের অস্তিত্ব ছিল না বা নেই। দ্বিতীয়ত, বিশেষ করে ওই 'প্রাচীন' গদ্যকেই 'ঐতিহ্যবাহী' বলার অর্থ কি? তবে কি বর্তমানে প্রচলিত গদ্য ঐতিহ্যবাহী নয়? এই দৃষ্টিভঙ্গিও একেবারে একদেশদর্শী এবং অন্ধতাপ্রসূত। খুব সম্ভব, যুগান্তরবাবু 'ঐতিহ্য' বলতে ইংরেজপূর্ব বাংলার সামাজিক রীতিনীতির অনুষঙ্গবাহী শব্দ, বাক্যাংশ বা দৃষ্টিভঙ্গিকে বোঝাচ্ছেন। এটা ঠিক যে, ওই সমস্ত শব্দ ইত্যাদি পুরোপুরি বর্তমান গদ্যে প্রচলিত নেই। এবং এও ধরে নেওয়া যায়, ওই ধরনের কিছু কিছু শব্দ, বাক্যাংশ ইত্যাদির পুনরুদ্ধার আধুনিক গদ্যকে সমৃদ্ধই করবে। তবু একথা বলতেই হবে যে, যা প্রাচীন তার সবটুকুই আমাদের ঐতিহ্য নয়। ইতিহাসের কিছু অংশ পরবর্তী জীবনচর্যার ধারাবাহিকতায় প্রবাহিত হয়, আর কিছু স্বভাবতই যায় আস্তাকুড়ে। অতএব যা কিছু আমাদের পুরনো ইতিহাসের অন্তর্বর্তী, তাকেই 'ঐতিহ্য' বলে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা হাস্যকর প্রাচীনতাপ্রীতি ছাড়া আর কিছু নয়।

অতঃপর, বিবেচনা করা যাক, কমলকুমার মজুমদারের 'ভাষাচিন্তা ও ঐতিহ্যবোধ' ব্যাপারটি কি। কী সেই ভাষা, যার কথা বলতে গিয়ে যুগান্তরবাবু বারবার নিজের সমালোচক-সত্তাকে চোখ ঠার দিয়ে পাশ কাটাবার চেষ্টা করেন। একাধিকবার ন্যায়ত তিনি প্রশ্ন তোলেন:

"উপন্যাসের ভাষামুক্তির প্রয়োজনে বাংলাগদ্যের ধারাবাহিক ঐতিহাসিক বিবর্তন কি কিছুমাত্র সত্য নয়?" (প্রসঙ্গত, লক্ষ্যণীয় যে 'বাংলা গদ্যের ধারাবাহিক ঐতিহাসিক বিবর্তন' ব্যাপারটি যুগান্তরবাবু কিন্তু ভালো করেই জানেন এবং মানেন।)

কিংবা:

"আপনকালের কথিত ভাষায় শুদ্ধতার জটিল সম্ভাবনা অনুসন্ধান না করে 'অন্তর্জলী যাত্রা'য় উপন্যাসের ভাষাশক্তির কোন প্রয়োজন সাধিত হয়?"

এবং :

"কথিত ভাষা ও ভাষা-ঐতিহ্যের সমন্বয়ে উপন্যাসের ভাষাচিন্তার প্রয়োজনীয় সমাধান যদিও 'অন্তর্জলী যাত্রা'য় অসম্পূর্ণ থাকে…"

তথাপি, প্রায় প্রত্যাদেশ পাওয়ার সুরে, পরিশেষে যুগান্তরবাবু বলেন :

"…তথাপি কমলকুমার মজুমদার-নির্দেশিত ভাষা-ঐতিহ্যের উৎসেই হয়তো বাংলা গদ্যভাষার মুক্তি নিহিত আছে।"

—কেন ? কোনো কারণ তিনি নির্দেশ করেন নি। কেননা, সম্ভবত, প্রত্যাদেশের কোনো কারণ নির্দেশ করা যায় না। তাই এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি সাহিত্যিক রায় আমাদের মাথা নিচু করে শুনে যেতে হয়।

কিন্তু কমলবাবুর 'ভাষা-ঐতিহ্য' বস্তুটি কি ? এটা ঠিক যে, তাঁর ভাষা বর্তমান বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের প্রচলিত লব্জ নয়। কমলবাবু তাঁর গদ্যে কিছু পরিমাণে অধুনা-অব্যবহৃত বা স্বল্পব্যবহৃত অপেক্ষাকৃত পুরাতন (archaic) শব্দ, শব্দসমষ্টি ও বাক্যাংশ ব্যবহার করে পাঠকের স্বাদবদলের আয়োজন করেন। যদিও, আমার ধারণা, এই সমস্ত শব্দ-আহরণে বা 'ভাষা-ঐতিহ্যে'র সন্ধানে তাঁকে অধিকাংশ সময়েই বঙ্কিম কি বড়জোর বিদ্যাসাগর-যুগ পর্যন্ত পিছু হটতে হয়, তার বেশি নয়। কিন্তু কমলবাবুর ভাষার যে-গুণটি বিশেষ করে পাঠকসাধারণকে আকৃষ্ট করে এবং সম্ভবত যার সন্ধান পেয়েই যুগান্তরবাবু তাঁকে নতুন করে আবিষ্কার করে ফেলেছেন, তা হল ব্যঞ্জনার সমৃদ্ধি। কমলবাবুর ভাষায় চিত্রময়তা এবং অতর্কিত ব্যঞ্জনার এই প্রসাদ, এই শিল্পগুণ তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এদিক থেকে বেশ কিছু প্রশংসা কমলবাবুর অবশ্যপ্রাপ্য। কিন্তু হলে হবে কী, এরই সঙ্গে কমলবাবু তাঁর নিজশিল্পের মৃত্যুবাণও বেশ আয়াস করে গড়ে তুলেছেন। তা হল, তাঁর অতিরিক্ত, অপ্রতিরোধ্য ভাষা-মনস্কতা এবং মানসিক খামখেয়াল বা উৎকেন্দ্রিকতা। এই উৎকেন্দ্রিকতা থেকে তাঁর ভাষায় বেশ কিছু দোষও বর্তেছে। যেমন, প্রথমত, কমলবাবুর গদ্যে থেকে থেকে গুরুচণ্ডালীর আকস্মিক ও শ্রুতিকটু প্রয়োগ। ফলে, এ-সমস্ত ক্ষেত্রে ভাষার ভারসাম্য নষ্ট হয় :

(ক) "চতুর্দোলার আসনে যজ্ঞবাট করা হইয়াছে, চারিভিতে ছোঁড়া কদলীবৃক্ষ লাল সূতা দিয়া গণ্ডীবদ্ধ।"

(খ) "সে বলিতে চাহিল, আচ্ছা সারা দুনিয়ার লোক মিলে যদি হা হুতাশ করে, আকাশে কি তাহলে টেলিগ্রাফ হবে ?"

এখানে (ক)-অংশের 'ছোঁড়া' ও (খ)-অংশের 'টেলিগ্রাফ' শব্দটি লক্ষণীয়। তাছাড়া দ্বিতীয় শব্দটির (একেলে শিল্পাঞ্চলের বুলির) ব্যবহারে স্থান ও কালানৌচিত্য-দোষও ঠাহর করবার মতো। এভাবে পাঠককে চমক দেওয়ার চেষ্টা কিন্তু শেষ পর্যন্ত কমলবাবুর পক্ষে অশুভ হয়ে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয়ত, কমলবাবু ক্রিয়ার কাল সম্পর্কে প্রায়-নিরঙ্কুশ। অবশ্য সংস্কৃত বা ইংরেজি ভাষার মতো বাংলায় ক্রিয়ার কালের ব্যবহার সম্পর্কে অতটা কড়াকড়ি নেই এবং অতীতের আওতায় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং ভবিষ্যতে অতীত ও বর্তমান কালের সুসমঞ্জস, সংযত প্রয়োগ বাংলায় যথেষ্টই চলে। কিন্তু মনে হয়, কমলবাবু ভাষারচনায় 'সামঞ্জস্য' ও 'সংযম' কথা দুটোর তেমন পক্ষপাতী নন। তাই এক্ষেত্রে তিনি আংশিক স্বাধীনতার একেবারে পরাকাষ্ঠা করে ছাড়েন। আমরা জানি, প্রতিটি অনিয়মের মধ্যে একটি অলিখিত নিয়ম থাকে। এক্ষেত্রে সেই অলিখিত নিয়মটি সময় সময় কমলবাবু এমন মজাদারভাবে লঙ্ঘন করেন যে মনে হয় বুঝি-বা তিনি স্বয়ং মহাকালের মতো সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে কালবাচক ক্রিয়াপদগুলিকে তাদের নিজ নিজ মর্জি অনুসারে যত্রতত্র স্থানগ্রহণের অবাধ অধিকার দিয়েছেন :

(ক) "গীতের বাণী পোড়া কাগজের মতো গঙ্গার হাওয়ায় ফরফর করিয়া উড়িয়া যাইতেছিল, তথাপি শ্রোতাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল ; বৈজু এখনও তাহার হাঁটুর প্রায় কাছেই চাপড় মারিয়া হৈ-হৈ করিয়া গাহে।"

(খ) "এখন তাঁহাদের পরিক্রমণ করিয়া সাত পাক চলিতেছে, সীতারাম অনেকবার আপনার ভারাক্রান্ত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া দেখিতে চাহিলেন, ফলে তাঁহার দুর্বল স্কন্ধই কাঁপিয়াছিল।"

তৃতীয়ত, কমলবাবুর যে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যটির কথা আগেই বলা হয়েছে, অর্থাৎ, তাঁর ভাষার চিত্ররূপময়তা ও ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধি এবং যে-বিশেষ গুণটি আয়ত্ত করার জন্যে তাঁকে ভাষার খাঁটি বাঙালিয়ানা বা তথাকথিত 'শুদ্ধতা' পরিহার করে অনেক সময় ইংরেজি বাক্যগঠনের অনুসরণে বাক্যান্তর্গত অসংলগ্ন অপ্রধান বাক্য বা বাক্যাংশ (parenthesis) ব্যবহার করতে হয়, সময় সময় সেই বৈশিষ্ট্যটিরও অসংযত ও উৎকেন্দ্রিক প্রয়োগ কষ্টপাঠ্য হয়ে দাঁড়ায়। ইংরেজি-শিক্ষিতের বাংলা ভাষায় ইংরেজি-ধরনের চিন্তা ও বাক্যবিন্যাসের প্রভাব অবশ্য গত একশো বছর ধরে একরকম স্বতঃসিদ্ধ। এতে আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু মতান্তরের ন্যায্য কারণ থাকে তখন, যখন কমলবাবুর

অসতর্ক (কিংবা অতি-সতর্ক ?) গদ্য সাবেকি ইংরেজি গদ্যের প্রায় তর্জমা বলে ভ্রম হয় :

(ক) "প্রজ্বলিত চিতা তাহার পথরোধ করিল ; যে চিতা, যাহা দাহ্যমান (sic !), যাহা অনির্ব্বাণ, যাহা শেষ, যাহা বন্ধুহীন !"

(খ) "বৈজুনাথের ওষ্ঠ ওঠানামা করে ; ঝটিতি, এই গহনরাত্রে যাহার একান্তে কুয়াশা আবৃত থরধারা, তাহার ভগ্নস্বর শ্রুত হইল ।"

অথচ মজা এই, যুগান্তরবাবুরা কমলকুমারের ভাষার কবিত্ব ও অভিনবত্বে এতদূর মুগ্ধ যে সে-ভাষায় ইংরেজির এই প্রবল প্রভাব তাঁদের চোখ সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছে। তাঁরা বোধহয় অচলিত বাংলা শব্দের নামাবলীটি দেখেই কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা, সে-নামাবলীর আড়ালে কোন্ ম্লেচ্ছ উঁকি দিচ্ছে সেদিকে নজর দেবার ফুরসত নেই।

পরিশেষে, বলা দরকার, এত কথা থেকে কেউ যেন না মনে করেন বর্তমান পত্রলেখক কমলবাবুর সাহিত্যের বিরোধী। বিশেষ করে পত্রলেখক তাঁর 'অন্তর্জলী যাত্রা'র সত্যিই গুণগ্রাহী। অল্পাধিক বীভৎস ও অতি-নাটকীয়তা-ত্রুটি সত্বেও, মহাশ্মশানে নিশ্চিত বিনাশের মুখোমুখি সীতারাম, যশোবতী ও চাঁড়াল বৈজুনাথের অভিনব পরস্পর-সম্পর্ক ও জীবনলীলা এবং সেই অমোঘ বিনাশ ও ক্ষয়ের বিরুদ্ধে যশোবতী-বৈজুনাথের তীব্র, তীব্রতর প্রতিবাদের প্রবল অভিঘাতে এই পত্রলেখকও অভিভূত ! বিশেষত এক ট্র্যাজিক পরিণামের পূর্বাহ্নে এই তীক্ষ্ম মানবিক আবেদনটুকুই কালের দুস্তর ব্যবধান সত্বেও উপন্যাসের ঘটনার সঙ্গে পাঠকের মনের সেতুবন্ধন ঘটায়। অধিকন্তু, কমলবাবুর ভাষার পূর্বোক্ত চিত্রময়তা ও ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধি এই সাযুজ্য সংঘটনে সাহায্য করে। বইটিকে পুরোদস্তর উপন্যাস বলা চলে কিনা এবং এটি কী সে-বিষয়ে তর্কের অবকাশ থাকলেও, রচনাটি নিঃসন্দেহে বর্তমান বাংলা কথা-সাহিত্যে একটি উল্লেখ্য ও বিশিষ্ট সংযোজন। তবু, সব সত্বেও আবার বলব, কমলকুমার মজুমদারের ভাষায় অতিরিক্ত আয়াসচিহ্ন, মুদ্রাদোষের আধিক্য ও উৎকট উৎকেন্দ্রিকতা তাঁর শিল্পের রসোপলব্ধির পথে প্রচণ্ড বাধাস্বরূপ। 'অন্তর্জলী যাত্রা'য় যদিও এ-ত্রুটি অপেক্ষাকৃত কম চোখে পড়ে, তাঁর দুর্বলতর বেশ কিছু রচনায় তবু এই বাধাই একেবারে শিল্প-সংহারক মূর্তিতে দেখা দেয়।

একটা কথা। শুধু যুগান্তরবাবু নন, সম্প্রতির লেখক-সমালোচক মহলে

তথাকথিত 'শুদ্ধতা' ব্যাপারটি সম্পর্কে একটা অন্ধ ভক্তি বা fetishism লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সম্ভবত, 'শুদ্ধতা' বলতে এঁরা বস্তু বা শিল্পের বিশুদ্ধ রূপ কিংবা যাথার্থ্য বোঝাতে চাইছেন। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনচর্যায় ও মানসিকতায় শুদ্ধতার একান্ত অভাব থেকেই কি এর এত চাহিদা ? সে যাই হোক, কিন্তু যুগান্তরবাবুরা কি মনে করেন, শব্দের জোড়-বিজোড় খেলায় মেতে শুধুমাত্র শিল্পের মাধ্যমে 'শুদ্ধতা'-চর্চায় পরমার্থ মিলবে ? শুদ্ধতা-অর্জন কি শুধুই শিল্পনৈপুণ্যের আয়ত্ত ? মূলত, শিল্পীর জীবনচর্যাগত ও আত্মিক শুদ্ধতা থেকেই কি শিল্পে শুদ্ধতা আসে না ? যুগান্তরবাবুদের লেখা পড়ে কিন্তু মনে হয়, তাঁরা শুদ্ধতা-অর্জনের 'মেড-ইজি' বুঝি আবিষ্কার করে ফেলেছেন ! কিন্তু তাঁদের মনে রাখতে অনুরোধ করি, শিল্পের শুদ্ধতা শুধু পুরাতন শব্দ ও ভাষা-নির্বাচনে নেই, যেমন নেই ধর্মের শুদ্ধতা ফোঁটা-তিলক-নামাবলী আর বিধিমতে সন্ধ্যাহ্নিকের মধ্যেই। ইতি—

অনিরুদ্ধ রায়

"চিত্রভাষা ও সমকালীন শিল্পী"

সম্পাদক সমীপেষু,

বেশ কিছুকাল পূর্বে 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত "ভারতীয় শিল্পী এবং সমকালীন শিল্প" শীর্ষক শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের মননশীল প্রবন্ধটি পাঠ করে পরিচয়ের পাঠক হিসেবে আমার মনে কয়েকটি প্রশ্ন জেগেছে।

লেখক নিজে শিল্পী। আর, ভূমিকাতেই মধ্যযুগের হারিয়ে-যাওয়া "আলপনা আঁকা দূর দূরান্তের" স্মৃতির জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন ; তার জন্য দায়ী করেছেন যন্ত্রদানবকে। প্রশ্ন করি, সামন্ততান্ত্রিক জীবনবিন্যাসের উপাদানই কি তাঁর মতে শ্রেষ্ঠ আর্টের বাহন ? আর যন্ত্র কি শুধু দানবই, না যন্ত্র যন্ত্রই—যার সাহায্যে মানুষ প্রকৃতির কাছ থেকে অধিক আদায় করতে পারছে। যে সমাজব্যবস্থা মানুষের শ্রমকে রূপান্তরিত করে মুনাফায় সেখানে সে দানব ; কিন্তু যেখানে মানুষের শ্রম তার সমাজের প্রত্যেকের মহত্তম বিকাশের জন্য, সেখানে যন্ত্র কি বন্ধু নয় ? কায়িক শ্রমকে লাঘব করে সেই তো করে দেয় বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর শিল্পচর্চার অবকাশ।

আর পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সংস্পর্শ আজ নতুন নয়, রামমোহন

থেকে রবীন্দ্রনাথ তার ফলশ্রুতি। কাজেই সংস্কৃতির রূপ শুধু বর্তমানেই বদলাচ্ছে না, অনেক আগেই বদলেছে।

তাছাড়া, আজকে শুধু পশ্চিমী সভ্যতার সংস্পর্শ বললে সব কিছু বলা হয় না। ভিন্নধর্মী সমাজবিন্যাসে এবং রাষ্ট্রব্যবস্থায় পশ্চিমের নানা দেশে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে আমাদের দেশের শিল্পী তার অনুকূল রুচির মালমশলা সেখান থেকে গ্রহণ করছেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পথ বেয়ে শিল্পীর সৃজন শক্তিকে যে সমস্ত উদ্দীপক উদ্বোধিত করছে সেখানে সে সার্থকতা লাভ করছে সন্দেহ নেই, কিন্তু যেখানে নতুন আন্দোলনের জন্যই আন্দোলন, সস্তা মোক্ষই মুখ্য—ব্যর্থতা সেখানে দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট। দেবব্রতবাবুর কাছে সে আলোচনার প্রত্যাশা স্বভাবতই থাকে।

নতুন শিল্পধারার আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি দুটি শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছেন, একটি অন্তর্মুখী অপরটি বহির্মুখী। সুররিয়ালিজম্ এবং কিউবিজম্ কোন সংজ্ঞা বহির্মুখী জানা নেই। কারণ সুররিয়ালিজমের ভিত্তিই যে তথাকথিত অবচেতনকে নিয়ে এটাই জানা ছিল এতদিন। আমি শিল্পরসিক নই, তবে চারদিকে চোখ মেলে তাকিয়ে যেটুকু শিক্ষার অবকাশ পেয়েছি তাতে ব্যাপারটা একটু গোলমেলে মনে হয়েছে।

মাতৃভাষার একটা সীমিত গণ্ডী আছে জানি কিন্তু শিল্প-ভাষা যে সম্পূর্ণ জাতিগত এটা জানা ছিল না। রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালা বাংলা সাহিত্যের গল্প, নিঃসন্দেহ। কিন্তু যে কোনো ভাষায় অনূদিত হলে পাঠকরা কি তার রসগ্রহণে অসমর্থ হবেন। র‍্যাফেলের মোনালিসা কি আমাদের কাছে কোনো সংবেদনের সৃষ্টি করে না। তাছাড়া, বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো যেদিন থেকে আমাদের সংস্কৃতি জগতে সাদর অভ্যর্থনা পেয়েছে, সেদিনই কি সে আন্তর্জাগতিক চরিত্রে অভিষিক্ত হয় নি। তাতে আমাদের ভাষা কিংবা শিল্পের অগ্রগতি কি ব্যাহত হয়েছে না সমৃদ্ধতর রূপ পেয়েছে। ভাষা-প্রীতি মানুষের জন্মগত, কারণ সে-ভাষা তার চিন্তা এবং অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম। এবং সেই ভাষাকেই সমৃদ্ধ করার জন্যই সে বিশ্বের সঙ্গে করে মিতালি। চিত্রের ভাষা মূক ভাষা, কাজেই তাকে বুঝতে হলে হরফ চিনতে হয় না বরং রঙ ও রেখার বিশ্বজাগতিক রূপেই সে মুখর। ভাষা-প্রীতি কিংবা দেশীয় পদ্ধতিতে শিল্প-রচনা কোনোক্রমেই আন্তর্জাতিকতার বিরোধী হতে পারে না। অতিরিক্ত স্বদেশীয়ানার জেরই বিশ্বের ইতিহাসে বেদনাদায়ক।

রমেন্দ্রনাথ দাস

কেনেডির রক্তাক্ত অপসারণ ও "মুক্ত গণতন্ত্র"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরুণ প্রেসিডেন্ট জন ফিট্জেরাল্ড কেনেডির হীন রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড যেমন মর্মান্তিক, তেমনই নিষ্ঠুর। এই শোকাবহ ঘটনায় সাম্প্রতিকালের মধ্যে সারা বিশ্ব এমন চকিত নাড়া খেয়েছে, যা আর কিছুতে নয়। স্বদেশীয় আততায়ীর গুলিতে পুঁজিবাদী দুনিয়ার শিরোমণি রাষ্ট্র মার্কিন দেশের সর্বপ্রধান ক্ষমতাসীন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতিকেও যে অকালে তরুণ বয়সে রক্তাক্ত দেহে ভূলুণ্ঠিত হতে হয়েছে, এ ঘটনার তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। কারণ, আততায়ী একজন নয়, এ নৃশংস হত্যার রহস্যসূত্র যত বেশি ঘনীভূত হয়েছে, তত বিশ্ববাসী দেখেছে—এই প্রেসিডেন্ট হত্যার পিছনে রয়েছে দস্তুরমত সংগঠিত একটি চক্র, হত্যাকারী সে মাত্র কেউ একজন নয়—তাহলে এরা কারা?

টেক্সাসের ডালাস, যেখানে মার্কিন রাষ্ট্রপতি খুন হলেন সেই শহরের বাতাস পর্যন্ত কুৎসিত বর্ণবিদ্বেষে বিষিয়ে-ওঠা। হত্যাকাণ্ডের পট যত উদ্ঘাটিত হচ্ছে তত দেখা যায় পর পর আরও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হল। অসওয়াল্ড, যাকে প্রেসিডেন্টের খুনের দায়ে ধরা হল, দেখা গেল তাকেও খুনের জন্য এগিয়ে এল আর একজন, জ্যাক রুবি। ডালাসের পুলিশের দপ্তরে প্রকাশ্য দিবালোকে সাংবাদিকদল আর পুলিশের চোখের সামনে প্রেসিডেন্টের আততায়ীকে আর একজন গুলি করে মেরে যায়—এ রহস্যের মর্মভেদ কে করবে? তার আগেই খুন হয়ে যায় আরও দুজন। প্রতিদিনের সংবাদপত্রে দুনিয়ার চার কোণের মানুষ এই সব সংবাদ-হেডলাইন দেখে দেখে স্তম্ভিত হন। মার্কিন দেশের সাধারণ মানুষ দেখেন টেলিভিশনের পর্দায় পর পর হত্যাকাণ্ডগুলির দৃশ্য, আর শিহরিত হন। এই সব কি কেনেডি হত্যাকাণ্ডের সমস্ত সাক্ষ্য সূত্রগুলি লোপ করে দেবার সুপরিকল্পিত ঘটনা-পরম্পরা নয়? তরুণ প্রেসিডেন্টের হত্যা, তারপর সেই শোকাহত প্রেসিডেন্ট পত্নী জ্যাকুইলিন কেনেডি, তাঁর দুই শিশু—ক্যারোলিন ও জন; টেলিভিশনের পর্দার প্রতিফলনে এই মর্মস্পর্শী দৃশ্য ভেসে ওঠে—শোকে ও আঘাতে সকলেই বিমূঢ় হয়ে যান।

কিন্তু, প্রেসিডেন্ট হত্যাবৃত্তান্ত যত স্পষ্ট হচ্ছে, তত দেখা যাচ্ছে মার্কিন রাষ্ট্রে উগ্রতম সমরবাদী জঙ্গী দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলি কেনেডি হত্যার পিছনে কেমনভাবে জোটবদ্ধ হয়ে কাজ করছিল। এটা কি সত্য নয় যে,

মার্কিনেরই প্রতিক্রিয়ার উগ্রতম শক্তিগুলিই কেনেডির কিছুটা বাস্তববাদী উদারনৈতিক 'নিউ ফ্রন্টিয়ার্স' দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতায় নেমে পড়েছিল? আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কেনেডিকে হারিয়ে দেবার জন্য সেনেটর গোল্ড-ওয়াটারকে ঘিরে ওদেশজোড়া দক্ষিণপন্থী সমাবেশ—যার কর্ণধার ছিলেন টেক্সাসের সেনেটর টাওয়ার? কেনেডি হত্যাকে কুহেলিকা করে কমিউনিজম ও কিউবা-বিরোধী জিগির তোলবার সুপরিচিত ফ্যাসিস্ত কায়দা? 'নিউ ফ্রন্টিয়ার্স' দৃষ্টিভঙ্গির প্রেসিডেন্ট বিশ্বাসী হয়েছেন বাস্তবগতভাবে ক্রুশ্চেভের "শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান"-এ, প্রথম দিকে কিউবায় হটকারিতার পর সম্মত হয়েছেন অনাক্রমণ প্রতিশ্রুতিতে, পারমাণবিক পরীক্ষার আংশিক নিরোধের মস্কো চুক্তিতে স্বাক্ষর দিয়েছেন এবং সেনেটকে দিয়ে তা গ্রহণ করিয়েছেন, ক্রেমলিনের সঙ্গে হোয়াইট হাউসের "হটলাইন" যোগাযোগে এসেছেন, এবং স্বীকার করেছেন "স্নায়ুযুদ্ধ সম্পর্কে নীতি পুনর্বিবেচনা"য়। মনে পড়ে রুজভেল্টের "নিউ ডীল"-ও মার্কিন দেশের চরম প্রতিক্রিয়ার বিরাগভাজন হয়েছিল।

কিন্তু, ততোধিক। পুঁজিবাদী দুনিয়ার চূড়ামণি মার্কিন রাষ্ট্রে কোটি কোটি নিগ্রোর স্বাধিকার নেই, আজও অ্যাব্রাহাম লিঙ্কনের সংস্কার উদ্যোগের পুরো এক শতাব্দী পরেও। "মুক্ত গণতন্ত্র"ই বটে! তরুণ কেনেডি লিঙ্কনের এক শত বছর পরেও তাঁর আরব্ধ কিছু কাজকে সমাপন করবেন কেন ভেবেছিলেন, নিগ্রো "সিভিল রাইটস বিল" আনতে চেয়ে? প্রেসিডেন্টের এ এক অমার্জনীয় "অপরাধ"। নিশ্চয়ই, "মুক্ত গণতন্ত্র"! এমনই "মুক্ত ও অবাধ গণতন্ত্রে"র পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা যে তার জন্য হিংস্র হত্যাকাণ্ডে তাই রাষ্ট্রপতি কেনেডির রক্তাক্ত অপসারণ হতেই হয়।

মার্কিন দেশের ৩৫তম রাষ্ট্রপতির এরকম নগ্ন ফ্যাসিস্ত কায়দায় অপসারণ ক্রিয়ার পর, নতুন ৩৬তম রাষ্ট্রপতি জনসন বলেছেন কেনেডি নীতিকে তিনি চালু রাখবেন। ইতিহাস তাঁর এ প্রতিশ্রুতি পরীক্ষা করবে। আমরা আপাতত আমাদের দেশেরই কিছু "মুক্ত গণতন্ত্রে"র পূজারীদের কাছে নিবেদন রাখি: অবাধ ব্যক্তি-স্বাধীনতা, এমন কি "শিল্পীর স্বাধীনতা"র জন্য তাঁরা কোনো এক বিশ্ববীক্ষাকে চুরমার করে দিতে সম্প্রতি মরীয়া হয়ে উঠেছিলেন; তাঁরা আজ স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করুন: "মুক্ত দুনিয়ার" অবাধ "ব্যক্তি-স্বাধীনতা" কতখানি, যেখানে নাগরিক সমানাধিকারের সামান্যতম সৎ প্রচেষ্টা করতে গিয়েও জন ফিটজেরাল্ড কেনেডির মতো ক্ষমতাশীর্ষাধিষ্ঠিত একজন প্রতিভাবান

তরুণকে ধূমায়িত বন্দুকের নলের মধ্য দিয়ে নিজের "ব্যক্তি-স্বাধীনতা"টুকুকে চিরকালের মতো বিসর্জন দিতে বাধ্য হতে হয়। জানি না, এই ভয়াবহ মর্মান্তিক ঘটনাটির তাৎপর্য যদিইবা তাঁদের মস্তিষ্কে ঢোকে!

পুঞ্চের শোক

বিগত মাসে শোচনীয় জীবনাবসানের তালিকায় যুক্ত হল পুঞ্চের কাছে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় নিহত ভারতীয় সেনানীমণ্ডলীর পাঁচজন সেনাধক্ষ্যের নাম। আমাদের জাতীয় প্রতিরক্ষায় এই সেনাধক্ষ্যদের শোকাবহ অকালমৃত্যু যে গুরুতর ক্ষতিসাধন করল। রাষ্ট্রীয়ভাবে তাঁদের অন্ত্যেষ্টি পালিত হয়েছে।

পানিক্করের মৃত্যু

সর্দার কে. এম. পানিক্করের মৃত্যু শুধু মাত্র একজন খ্যাতনামা কূটনীতিজ্ঞকে নয়, একজন প্রখ্যাত ইতিহাসবেত্তা ও চিন্তাবিদকেও জাতীয় জীবন থেকে হরণ করল। আমরা আমাদের শোক জ্ঞাপন করি।

শঙ্কর দেব

পাঠক ও অনুরাগীদের প্রতি নিবেদন

আগামী ১৯৬৪ সালে শেক্সপীয়রের চারশততম জন্মবার্ষিকী উৎসব সারা পৃথিবী জুড়ে উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে, 'পরিচয়'-ও তার সীমাবদ্ধ সাধ্য নিয়ে এই শেক্সপীয়র উৎসবে যোগদানের আয়োজন করছে। আগামী বছর মে মাসে এজন্য 'পরিচয়'-এর একটি বিশেষ শেক্সপীয়র-সংখ্যা প্রকাশ করা হবে। শেক্সপীয়র-বিশেষজ্ঞ, বিদ্বৎজন ও খ্যাতনামা কবি-সাহিত্যিকদের রচনাসহ এই সংখ্যাটিকে যথোচিত সমৃদ্ধ করার প্রয়াসে কোনও চেষ্টারই ত্রুটি রাখা হবে না। দেশ-বিদেশে শেক্সপীয়র-চর্চার বিবরণীও আমরা ঐ সংখ্যাটিতে সংযোজিত করতে পারব বলে আশা রাখছি। এই উপলক্ষেই 'পরিচয়'-এর পরবর্তী কয়েকটি সংখ্যার মধ্যেই আমরা শেক্সপীয়রের জীবন-আখ্যান নিয়ে রচিত ব্রিটিশ নাট্যকার ক্লিমেন্স ডেন-এর কাব্যনাট্য 'will Shakespeare ; an invention in four acts' কাব্যনাট্যটি ধারাবাহিকভাবে পত্রস্থ করব। এর অনুবাদ করেছেন রুদ্র সেনগুপ্ত।

প্রসঙ্গত, 'পরিচয়'-এর অগণিত পাঠক ও সুহৃদ-অনুরাগীদের কাছে আমরা একটি নিবেদন জানিয়ে রাখি। সাম্প্রতিক কয়েকটি সংখ্যা থেকে 'পরিচয়'-এর ক্রমবর্ধিত চাহিদার সঙ্গে তাল রেখে আমরা অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের 'পরিচয়'-পত্রিকার যোগান দিয়ে উঠতে না পারায় ক্ষমাপ্রার্থী। সেজন্য, আরও অধিক সংখ্যায় 'পরিচয়' যাতে ছাপা হয়, তজ্জন্য আমরা এখন থেকে প্রেস ও কাগজ-সংক্রান্ত যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

শান্তি ও মৈত্রীর জন্য

'পরিচয়'-এর বিগত সংখ্যা এবং এই অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রকাশের মাঝামাঝি আমাদের দেশে এবং এই কলকাতা শহরেই যে সবচেয়ে বড় ঘটনা ঘটে গেল তা হল আমাদের দেশ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে এক গভীর ও ক্রম-উজ্জ্বলতর মৈত্রী ও সৌহার্দ্যের অভিব্যক্তি-ঘটানো অবিস্মরণীয় ঘটনাটি।

এই মহানগরেরই আতিথ্য গ্রহণ করে দিন দুই কাটিয়ে গেলেন সোভিয়েত মহাকাশচারীত্রয়ী, যার মধ্যমণি ছিলেন বিশ্বের প্রথম মহাকাশচারিণী শ্রীমতী ভ্যালেন্তিনা তেরেসকোভা। এবারের "মিছিলের শহর" তাঁদেরই উদ্দেশে নিবেদিত হল। এর কিছু আগেই হয়েছে রাঁচী ও দুর্গাপুরে সোভিয়েত সহায়তায় নির্মিত ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার উদ্বোধন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বিশ্বশান্তির স্বার্থে আমাদের উভয় দেশের মৈত্রীকে ব্যাপক ও দৃঢ়-ভিত্তিক করে তোলবার আহ্বান জানিয়েছেন। এই সেদিনই রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সোভিয়েত শিল্পীর ভাস্কর্য 'রবীন্দ্রনাথ' উপহারপ্রদান অনুষ্ঠান হয়ে গেল। এই সব ঘটনাই আমাদের দেশের সাম্প্রতিক গতিপথটির একটি দিকের নিঃসন্দেহ নির্দেশ দিচ্ছে।

সম্প্রতি দিল্লীতে 'পার্লামেন্টারিয়ান ফর পীস' সংস্থাটির উদ্যোগে "আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী ও বিশ্বশান্তি" সম্পর্কে অতি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত হল। আমাদের পার্লামেন্টের সর্বদলমতের আড়াই শত সদস্য এ সংস্থার আলোচনাচক্রের উদ্যোগী। বিদেশাগত প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সদস্যাসহ তিনজন প্রতিনিধি, যুগোশ্লাভ কমিটি অফ দি ইণ্টারপার্লামেণ্টারী ইউনিয়নের প্রতিনিধি, সিংহল পার্লামেন্ট, বৃটিশ পার্লামেন্ট সদস্য ও লেবর দলের সভাপতি, আরব লীগের প্রতিনিধি ও অন্যান্যরা। যে ছয়টি বিষয়ে এ আলোচনা-চক্রের কমিশনগুলি আলোচনা করলেন, বর্তমান বিশ্বে সেগুলির তাৎপর্য অসীম। যেমন, "নিরস্ত্রীকরণ ও পারমাণবিক বিপদ", "ভারত প্রতিবেশী দেশ ও পৃথিবী", "নিরস্ত্রীকরণের অর্থনীতি", "উপনিবেশবাদ", "বর্ণ-বৈষম্যবাদ ও মানবিক অধিকার" ও "ঠাণ্ডাযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক সহযোগের পথে পদক্ষেপ"। আলোচনার উদ্বোধনে শ্রীজওহরলাল নেহরুর ঘোষণাটিও স্পষ্ট: "আজকের

নানা অসুবিধা, চৈনিক আক্রমণ ও আমাদের প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও ভারতকে সচেষ্ট হতে হবে শান্তির জন্যই। কারণ শেষ পর্যন্ত শান্তিই হচ্ছে মৌল লক্ষ্য, আর অন্য সব সমস্যাই হচ্ছে আপেক্ষিকভাবে গৌণ।" বিশ্বশান্তি ও নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে আলোচনার জন্য ভারতের পার্লামেন্ট সদস্যরা যে আগামী দিনে এক বিশ্বশান্তি সম্মেলন আহ্বানের সিদ্ধান্ত নিলেন, তাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পীট সীগরের গান

কলকাতায় ঘুরে গেলেন আমেরিকার খ্যাতনামা লোকসঙ্গীতশিল্পী পীট সীগর। একাডেমি অব ফাইন আর্টস হলে তাঁর সঙ্গীতানুষ্ঠানে ও পার্ক সার্কাস ময়দানে খোলা মঞ্চে তাঁর গলায় গান শুনে বুঝি, সত্যিই এ এক অভিজ্ঞতা।

সম্প্রতি মার্কিন দেশের হতবুদ্ধিকর রাজনৈতিক ঘটনাকাণ্ডের পর, সেই দেশেরই আর এক সুস্থ, সুসমঞ্জস, গণসংস্কৃতির রূপ পীট সীগরের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হতে দেখে আমরা আর এক প্রাণবন্ত আমেরিকার স্পন্দন পেলাম। সে আমেরিকা হুইটম্যানের, মার্ক টোয়েনের, পল রোবসনের। 'টুইস্ট' নৃত্য আর 'পপ' সঙ্গীতের, রক-এন-রোল সংস্কৃতির এ আমেরিকা নয়। মার্কিন লোকসঙ্গীতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী, গীত-সংগ্রাহক, রচয়িতা ও সুরকার পীট সীগর। কার্ল স্যাণ্ডবার্গ যাঁর সম্পর্কে বলেন "তাঁকে আমি স্থান দেব মার্কিন লোকসঙ্গীত গায়কদের প্রথম সারিতে।"

নিজ দেশ আমেরিকার লোকগাথা সংগ্রহেই তুষ্ট না থেকে, এখন তিনি বেরিয়েছেন তাঁর সঙ্গীত-ভাণ্ডার ভরে তুলতে বিশ্ব পর্যটনে। তাঁর গানের ভাণ্ডার ভরে উঠছে শুধু ওদেশের নয়, ইউরোপ, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও এশিয়ার লোকসঙ্গীতের চয়নে। কলকাতায় দু-দিন থাকা কালে তিনি শুধু শহরেই কাটান নি, গেছেন বোলপুরে, দুবরাজপুর বাউল সম্মিলনে। সেখান থেকে তুলে নিয়ে এসেছেন বাংলার বাউল গান। আর কলকাতার সভায় দাঁড়িয়ে লোকসঙ্গীতের পর লোকসঙ্গীতের মালা গেঁথে শুনিয়ে আমাদের মুগ্ধ, বিচলিত, উদ্বুদ্ধ করে দিয়ে গেছেন। এই সব গানগুলির মধ্য দিয়ে মার্কিন দেশের মানুষের বেদনা, ক্ষোভ, শ্রম, আনন্দ, মুক্তি-কামনা ফুটে উঠেছে। গেয়েছেন কয়লা খনি শ্রমিকের গান, টেক্সাসের বন্দীদের গান, বক্সার ডেভিডমুরের মৃত্যুর প্রতিবাদে মুখর দৃপ্ত গান, নীলনয়ন বালকের ট্রাজিক গান,

ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্টের মৃত্যুতে লেখা গানটি ও জন কেনেডি হত্যার পটভূমিতে গেয়ে আমাদের উদ্বেল করেছেন। আর সগর্বে গেয়েছেন সেই ওয়েলিংটনে নিগ্রো মুক্তিপদযাত্রীর বিখ্যাত গানটি। "We shall overcome", যে গানটির মূল ও বঙ্গানুবাদ 'পরিচয়'-এর বর্তমান সংখ্যাতেই প্রকাশিত হল। লক্ষ লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান এই গান গেয়ে বর্ণসমানাধিকারের দাবিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানীতে অভিযান করেছিলেন। এই গানটি গাইবার সময় সীগর শ্রোতাদেরও কণ্ঠ মেলাতে ডাক দিয়েছিলেন, এবং তাঁর সঙ্গে মিলেছিল অনেকেরই কণ্ঠ। সত্যই সীগর-অনুষ্ঠান শোনা এক অভিজ্ঞতা।

কিন্তু এমন দরদী মানুষ ও শিল্পী সীগর কিন্তু স্বদেশে, বিশেষত ম্যাকার্থী-কলঙ্কিত দিনগুলিতে মার্কিন রাজ্যে নিষ্কণ্টকে দিন কাটাতে স্বভাবতই পারেন নি। "অমার্কিন কার্যকলাপ"-এর দায় তাঁর ওপরেও পড়েছিল এবং সেই একই অভিযোগে পল রোবসন, জন হাওয়ার্ড লসন, ডঃ ডুবয়া প্রমুখের সঙ্গে তিনিও ছিলেন অভিযুক্ত। দণ্ডাদেশও ছিল, পরে অবশ্য যেটা নাকচ করে দিতে হয়। সীগরের সঙ্গীতসাধন শুনে আমাদের দেশের প্রগতিশীল ও যৌথ গণ-সঙ্গীত শিল্পীদের আন্দোলনের মরাগাঙে যদি আবার স্রোত জাগে।

মনীষী সম্বর্ধনা

সায়াত নোভা অর্থ হল গানের রাজা। সম্প্রতিই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পৃথিবীর নানাদেশে আর্মেনীয় মহাকবি সায়াত নোভার আড়াইশততম জন্মবার্ষিকী উৎসব পালিত হল। পৃথিবীব্যাপী এ-উৎসব পালনের জন্য বিশ্বশান্তি পরিষদ আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর মাতৃভাষা আর্মেনীয় ছাড়াও, জর্জীয়, আজারবাইজানী ও প্রাচীন পারসিক ভাষাতেও সুপণ্ডিত কবি অনবদ্য কাব্য রচনা করেছিলেন।

আগামী জানুয়ারিতে আমাদের বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সপ্ততিতম জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে। এতদুদ্দেশে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও বিদ্বৎজনদের নিয়ে একটি জন্মোৎসব কমিটিও গঠিত হয়েছে। এই কমিটি এ উপলক্ষে একটি মূল্যবান স্মারক গ্রন্থ প্রকাশেরও ব্যবস্থা করছেন। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে 'পরিচয়' পত্রিকার অতি-নিকট সম্পর্ক। তাঁর কয়েকটি মূল্যবান রচনা প্রকাশের গৌরবও এই 'পরিচয়'-এরই। আমরা তাঁর সপ্ততিতম জন্মোৎসবের প্রাক্কালে তাঁর প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও নমস্কার জানাই।

এই বৎসর শান্তিনিকেতন পৌষ উৎসব ও সমাবর্তনে বিশ্বভারতী কবি অমিয় চক্রবর্তীকে "দেশিকোত্তম" উপাধিতে ভূষিত করে সম্মাননা জানাচ্ছেন। বাঙলা কবিতায় ও শিক্ষা শিল্প সংস্কৃতি জগতে কবি অমিয় চক্রবর্তীর অবদান স্বপ্রতিষ্ঠ। তাঁর সম্মাননায় আমরা আনন্দ প্রকাশ করি ও তাঁকে জানাই আমাদের শ্রদ্ধা।

পৌষ ১৩৭০

পরিচয়

